বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকা, তেতাল্লিশতম খণ্ড, গ্রীষ্ম সংখ্যা, জ্যৈষ্ঠ ১৪৩২/জুন ২০২৫
DOI: https://doi.org/10.64298/jasbbn.v43i.006

আবু মহামেদ হবিবুল্লাহর প্রবন্ধে বাঙালি মুসলমানের আত্মপরিচয়ের স্বরূপ

মো. আবু বকর সিদ্দিক*

সারসংক্ষেপ

বিশ শতকের প্রারম্ভে বাঙালি মুসলমান সমাজ তার প্রকৃত অস্তিত্বের খোঁজে ঐতিহাসিক পটভূমির দিকে দৃষ্টিপাত করে। প্রাবন্ধিক ও চিন্তক আবু মহামেদ হবিবুল্লাহ (১৯১১-১৯৮৪) বাঙালি মুসলমান সমাজের প্রতিনিধিদেরই একজন। নানান গবেষণামূলক প্রবন্ধে তিনি জাতি, জাতীয়তা এবং জাতিরাষ্ট্র নিয়ে নির্মোহভাবে পর্যালোচনা করেছেন এবং এরই সূত্র ধরে বাঙালি মুসলমানকে বাংলার হিন্দু ও বহিরাগত মুসলমানের থেকে স্বতন্ত্র ও আত্মপ্রতিষ্ঠিত জাতি হিসেবে উপস্থাপন করে তাদের পরিচয়গত হতাশা থেকে মুক্তির প্রয়াস চালিয়েছেন। আবু মহামেদ হবিবুল্লাহ বাঙালি মুসলমানের আত্মপরিচয়ের সংকট তৈরির পরিপ্রেক্ষিত বোঝার জন্যে বাংলার মুসলমানদের ইতিহাসের বাক্-পরিবর্তনসমূহ বিশ্লেষণ করেছেন। বাঙালি মুসলমানের আত্মপরিচয়ের স্বরূপ জানার জন্যে এ-জনগোষ্ঠীর ইতিহাস-ঐতিহ্য, বাঙালি মুসলমানের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ নিয়ে আলোচনা করেছেন। বাঙালি মুসলমানের আত্মপরিচয়ের ভিত্তি নির্মাণে তিনি জাতিগত পরিচয়, ভাষাগত পরিচয় ও সাহিত্যে তার সংস্কৃতির (মুসলিম সংস্কৃতি) যথার্থ প্রতিফলনের ওপর জোর দিয়েছেন। তিনি মুসলিম সংস্কৃতিকে প্রভাবশালী হিসেবে নির্মাণ করাকে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করেছেন। বক্ষ্যমাণ গবেষণায় আবু মহামেদ হবিবুল্লাহর *সমাজ সংস্কৃতি ও ইতিহাস* (২০১৭) গ্রন্থের নির্বাচিত প্রবন্ধে 'বাঙালি মুসলমানের আত্মপরিচয়ে'র প্রসঙ্গ কীভাবে এসেছে এবং তিনি বাংলার মুসলমানের সামগ্রিক ইতিহাসকে কীভাবে দেখেছেন তার পর্যালোচনা করা হয়েছে—একই সঙ্গে তিনি বাঙালি মুসলমানের আত্মপরিচয়ের সংকটের মূল কারণসমূহ কীভাবে চিহ্নিত করেছেন তা আলোচনা করা হয়েছে এবং এসব সংকট থেকে উত্তরণের জন্যে যে-উপায়সমূহ বাতলে দিয়েছেন তার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণও করা হয়েছে। সেই সঙ্গে তাঁর আলোচনার মৌলিকত্ব ও সীমাবদ্ধতাও বিচার করা হয়েছে। গবেষণা-ক্ষেত্রে প্রধানত পাঠবিশ্লেষণ পদ্ধতি অনুসৃত হয়েছে। আবু মহামেদ হবিবুল্লাহর সঙ্গে নির্ধারিত কালপর্বের অন্যান্য প্রাবন্ধিকের চিন্তার তুলনা করতে গিয়ে তুলনামূলক পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে।

চাবি শব্দ: বাঙালি মুসলমান, আত্মপরিচয় সংকট, ইতিহাসচেতনা, মুসলিম ঐতিহ্য, সাংস্কৃতিক আত্মনিয়ন্ত্রণ

১. প্রাক্কথন

বিশ শতকে বাঙালি মুসলমানের আত্মপরিচয় নির্মাণের ক্ষেত্রে একজন অগ্রগণ্য চিন্তক হলেন আবু মহামেদ হবিবুল্লাহ। তিনি দেশে ও বিদেশে শিক্ষক ও গবেষক হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছেন। হবিবুল্লাহ শিক্ষকতা করেছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ক্যানবেরা বিশ্ববিদ্যালয় (অস্ট্রেলিয়া) ও জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ে (দিল্লি)। শিক্ষক ও গবেষকসত্তার বাইরে হবিবুল্লাহ ছিলেন একজন মানবিক, সমাজ-সচেতন ও সংস্কৃতিমান মানুষ।[১] তিনি অসাম্প্রদায়িক

* সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, সিলেট-৩১১৪

জীবনবোধে বিশ্বাসী ছিলেন এবং জীবনব্যাপী মুক্তবুদ্ধির চর্চা করে গেছেন। তিনি তাঁর জীবদ্দশায় একজন ইতিহাসবিদ হিসেবে খ্যাতি পেয়েছিলেন এবং প্রগতিশীল ও সমন্বয়ধর্মী জাতীয়তাবাদী চিন্তক হিসেবেও পরিচিতি লাভ করেছিলেন। হবিবুল্লাহ ছিলেন উদার, মুক্তিবুদ্ধিসম্পন্ন ও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধে বিশ্বাসী। তৎসময়ের মুসলিম রক্ষণশীল ধারার বিপরীতে ছিল তাঁর অবস্থান।[২] হবিবুল্লাহর মানবতাবাদী মনন তাঁকে অসাম্প্রদায়িক চেতনায় উদ্বুদ্ধ করেছিল এবং তিনি জীবনের একটা বিশেষ সময় পর্যন্ত অখণ্ড সর্বভারতীয় রাজনীতি ও জাতীয়তাবাদে বিশ্বাসী ছিলেন।[৩]

আবু মহামেদ হবিবুল্লাহর গবেষণা ও সৃজনশীল রচনার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে মৌলিক গ্রন্থ, অনুবাদ, গবেষণা-প্রবন্ধ, সাধারণ প্রবন্ধ, সভাপতির ভাষণ, পুস্তক সমালোচনা ও যুক্তিনির্ভর প্রত্যুত্তর প্রভৃতি। তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হচ্ছে—*Foundation of Muslim Rule in India: A History of the Establishment and Progress of the Turkish Sultanate of Delhi: 1206-1290* (1945), *Descriptive Catalogue of Arabic, Persian and Urdu Manuscripts in Dacca University Library* (1966), *সমাজ সংস্কৃতি ও ইতিহাস* (প্রবন্ধ-সংকলন, প্রথম প্রকাশ: ১৯৭৪, কথাপ্রকাশ সংস্করণ: ২০১৭), *আলবেরুণীর ভারততত্ত্ব* (অনুবাদগ্রন্থ, ১৯৭৪) ও *বিলায়েতনামা* (১৯৮১) ইত্যাদি। অধ্যাপক হবিবুল্লাহর গবেষণায় বৈচিত্র্য ও প্রসারতার মূলে ছিল ভারতীয় উপমহাদেশের ইতিহাসচর্চায় প্রয়োজনীয় ভাষার ওপর তাঁর যথেষ্ট দক্ষতা।

আবু মহামেদ হবিবুল্লাহ ভারত ও বাংলার মুসলমানের ইতিহাস পর্যালোচনার মধ্য দিয়ে 'বাঙালি মুসলমানের আত্মপরিচয়' সংক্রান্ত ভাবনাসমূহ প্রকাশ করেছেন। তিনি তাঁর ইতিহাস-গবেষণার মধ্য দিয়ে বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস বিশ্লেষণ করে আত্মপরিচয় সংকটের মূল দিকটি সামনে নিয়ে এসেছেন এবং বাঙালি মুসলমান সমাজকে আত্মপরিচয়ের সংকট থেকে উত্তরণের জন্যে নানান দিকনির্দেশনাও দিয়েছেন। তিনি আত্মপরিচয় অনুসন্ধানে সমন্বয়বাদী ধারার সংস্কৃতির ওপর গুরুত্বারোপ করেছেন। এ-ক্ষেত্রে তিনি বাংলা অঞ্চলের সংস্কৃতির মধ্যে ঐক্যকে গুরুত্ব দিয়েছেন। তিনি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন, বাঙালি মুসলমানের আত্মপরিচয় নির্মাণের ক্ষেত্রে বাংলা ভাষা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। এছাড়াও তিনি বাঙালি মুসলমানের আত্মপরিচয়ের আলোচনায় বাংলার মুসলমানদের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস, ঐতিহ্য, জাতিসত্তা ও জীবনবোধ—প্রভৃতি বিষয়ে দৃষ্টি দিয়েছেন। বর্তমান গবেষণা-প্রবন্ধে বাঙালি মুসলমান সমাজের আত্মপরিচয় প্রসঙ্গে আবু মহামেদ হবিবুল্লাহর (*সমাজ সংস্কৃতি ও ইতিহাস* গ্রন্থে আলোচিত) অভিমত, যুক্তি, বিশ্লেষণ প্রভৃতির আলোকে তাঁর বক্তব্যের মূল্যায়ন করা হয়েছে।

২. আবু মহামেদ হবিবুল্লাহর প্রবন্ধে বাঙালি মুসলমানের আত্মপরিচয়ের স্বরূপ

আবু মহামেদ হবিবুল্লাহ ইতিহাসবিদ হিসেবেই খ্যাতি লাভ করেছেন। তাঁর লেখায় প্রাধান্য পেয়েছে মধ্যযুগের বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস ও ঐতিহ্যের নানান বিষয়। বাঙালি মুসলমানের

আত্মপরিচয়ের সন্ধান বিষয়েও তিনি অনেক প্রবন্ধ লিখেছেন। তবে তিনি বাঙালি মুসলমানের আত্মপরিচয়ের সংকট নিয়ে কোনো একক গ্রন্থ রচনা করেননি। আবু মহামেদ হবিবুল্লাহর বাঙালি মুসলমানের আত্মপরিচয় সংক্রান্ত চিন্তাভাবনা প্রধানত তাঁর লেখা বেশকিছু প্রবন্ধের মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছে। তাঁর গবেষণাকর্মের একটি উল্লেখযোগ্য দিক হলো বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধ। তাঁর লেখা অনেকগুলি প্রবন্ধ *সমাজ সংস্কৃতি ও ইতিহাস* (২০১৭) নামে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছে। এসব প্রবন্ধে ভারতীয় ও বাঙালি মুসলমান সম্পর্কে তাঁর নানান পর্যবেক্ষণের পরিচয় পাওয়া যায়। এই গ্রন্থে সন্নিবেশিত প্রবন্ধগুলির বিষয়বিন্যাসের দিকে আলোকপাত করলে দেখা যায় যে, মোট তেরোটি প্রবন্ধের মধ্যে পাঁচটি প্রবন্ধ ('ভারতের মুসলমান', 'বাংলার মুসলমান', 'বাঙালী মুসলমানের সাহিত্য, সংস্কৃতি ও সমাজ', 'বাঙালী মুসলমানের সাংস্কৃতিক আত্মনিয়ন্ত্রণ' ও 'বাঙালী মুসলমানের ইতিহাস') ভারতে ইসলাম প্রচার এবং বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস, সাহিত্য, সমাজ ও সংস্কৃতিভাবনা নিয়ে রচিত। এছাড়া উক্ত বইয়ে ইসলাম ও মুসলিম সভ্যতা সম্পর্কিত প্রবন্ধ রয়েছে চারটি ('মুসলিম মনীষা', ইসলামের ধর্ম ও সমাজ ব্যবস্থা', 'মুসলিম সভ্যতার স্বর্ণযুগ', ও 'মুসলিম সভ্যতার স্বর্ণযুগ: নগর ও রাষ্ট্র')। দুটো প্রবন্ধ উর্দুসাহিত্য ('উর্দু সাহিত্যের ভূমিকা' ও 'উর্দু ইতিহাস-সাহিত্য') নিয়ে লেখা। একটিতে ওহাবি আন্দোলন ('ভারতে ওহাবী আন্দোলন') এবং অন্য একটিতে ইতিহাসের সংজ্ঞার্থ ও স্বরূপ ('ইতিহাসের কি ও কেন?') নিয়ে আলোচনা স্থান পেয়েছে। বাঙালি মুসলমান সম্পর্কে আবু মহামেদ হবিবুল্লাহর দৃষ্টিভঙ্গিও এই বইয়ে প্রতিফলিত হয়েছে। বিশেষ করে, এই বইয়ের বেশকিছু প্রবন্ধে আবু মহামেদ হবিবুল্লাহ (যেমন—'বাংলার মুসলমান', 'বাঙালী মুসলমানের সাহিত্য, সংস্কৃতি ও সমাজ', 'বাঙালী মুসলমানের সাংস্কৃতিক আত্মনিয়ন্ত্রণ' ও 'বাঙালী মুসলমানের ইতিহাস') বাঙালি মুসলমানের আত্মপরিচয়ের স্বরূপকে তুলে ধরেছেন। এসব প্রবন্ধে তিনি বাঙালি মুসলমানের আত্মপরিচয়ের সংকটকে যেমন চিহ্নিত করেছেন, তেমনি সংকট থেকে উত্তরণের উপায়ও বাতলে দিয়েছেন। বর্তমান নিবন্ধে শেষোক্ত চারটি প্রবন্ধ বিশ্লেষণের আলোকে আবু মহামেদ হবিবুল্লাহর বাঙালি মুসলমানের আত্মপরিচয় সম্পর্কিত চিন্তার স্বরূপ পর্যালোচনা করা হয়েছে।

বাঙালি মুসলমানের আত্মপরিচয়ের স্বরূপ বোঝার জন্যে প্রাবন্ধিক ও চিন্তক আবু মহামেদ হবিবুল্লাহ অনেকগুলো প্রশ্নের উত্তর অনুসন্ধান করেছেন—বাঙালি মুসলমানের জাতিগত পরিচয় কীভাবে নির্মিত হয়েছে?, তার জাতিগত পরিচয় নির্মাণে ধর্মীয় পরিচয় কোনো বাধার সৃষ্টি করেছে কিনা?, বাংলায় ইসলামের প্রচার ও প্রসার কীরূপে হয়েছে?, বাঙালি মুসলমানের আত্মপরিচয় সংকটের জন্যে প্রধানত কাদের দায়ী করা যায়?, বাঙালি মুসলমান কেনো 'বাংলা ভাষা' ও 'বাঙালি সংস্কৃতি' নিয়ে প্রশ্ন উত্থাপন করে?, বাঙালি মুসলমানের সংস্কৃতি কী হবে?, তার সাংস্কৃতিক জগৎ কীভাবে নির্মিত হয়েছে?, বাঙালি মুসলমান কোন সংস্কৃতিকে গ্রহণ করবে এবং কেন করবে?, কীভাবে সে বাংলা সাহিত্যে ও বাঙালি সংস্কৃতিতে নিজের ইতিহাস, ঐতিহ্য তথা মুসলিম জীবনের পরিচয় ফুটিয়ে তুলবে?, বাঙালি মুসলমানের সাংস্কৃতিক আত্মনিয়ন্ত্রণের উপায় কী হবে?, সর্বোপরি, তার আত্মপরিচয়ের সংকট কীভাবে দূর হবে?—প্রভৃতি প্রশ্নের উত্তর অন্বেষণের মধ্য দিয়ে তিনি মূলত বাঙালি মুসলমানের আত্মপরিচয়ের স্বরূপকে তুলে ধরেছেন।

বর্তমান নিবন্ধে আবু মহামেদ হবিবুল্লাহর বাঙালি মুসলমানের আত্মপরিচয়ের স্বরূপ পর্যালোচনায় নিম্নোক্ত বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে—বাঙালি মুসলমানের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ, বাঙালি মুসলমানের আত্মপরিচয়হীনতার কারণ অনুসন্ধান, বাঙালি মুসলমানের সাহিত্যিক, সাংস্কৃতিক ও সামাজিক আত্মপরিচয়ের স্বরূপ, বাঙালি মুসলমানের সাংস্কৃতিক আত্মনিয়ন্ত্রণ এবং উপসংহারে গবেষণার ফলাফল পেশ করা হয়েছে।

২.১ বাঙালি মুসলমানের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ

আবু মহামেদ হবিবুল্লাহ তাঁর 'বাংলার মুসলমান' প্রবন্ধে বাঙালি মুসলমানের প্রত্যুষকালের ইতিহাস পর্যালোচনা করেছেন। এ-ক্ষেত্রে তিনি অনেকগুলো প্রশ্নের উত্তর অনুসন্ধান করেছেন। যেমন—বাংলায় ইসলাম ধর্মের প্রচার ও প্রসার কীরূপে হয়েছে?, বাংলার ইসলামের রূপ কেমন?, বাংলা কীভাবে তার স্বাতন্ত্র্য বা স্বাধীনতা হারিয়েছে?, বাংলার মুসলমানদের মধ্যে সম্প্রদায়গত বিভাজনের বীজ কারা রোপণ করেছে?—প্রাবন্ধিক প্রধানত এ-সব প্রশ্নের উত্তর অনুসন্ধানের মধ্য দিয়ে বাঙালি মুসলমানের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশকে তুলে ধরেছেন। বাঙালি মুসলমানের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ এবং তাদের আত্মপরিচয় সংকটের পরিপ্রেক্ষিত বোঝার ক্ষেত্রে উপর্যুক্ত প্রশ্নাবলির উত্তর জানার প্রয়োজন রয়েছে।

উত্তর ভারতে যেভাবে ইসলাম প্রচার হয়েছে, বাংলায় সেভাবে হয়নি। বাংলায় ইসলামের বাণী প্রথম এসেছিল আরব থেকে। সেটা স্থলপথে নয়, সমুদ্রপথে।[৪] তার প্রসার ঘটেছিল নীরবে। খ্রিষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর প্রথমভাগে আরব বণিক সম্প্রদায়ের ভারতে আগমনের সূত্র ধরে ভারতবাসী প্রথম ইসলাম সম্পর্কে অবহিত হয় বলে জানা যায়। তবে বাংলার সঙ্গে আরবের সম্পর্ক এ-দেশে ইসলাম আগমনের পূর্বেই শুরু হয়েছিল।[৫] তাছাড়া, প্রাক্-মুসলিম যুগে আরবের সঙ্গে বাংলার রাজনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনের পূর্বেই সাংস্কৃতিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছিল। প্রাবন্ধিক আবু মহামেদ হবিবুল্লাহ আরবের সঙ্গে বাংলার প্রাথমিক সময়ের সম্পর্ক বিশ্লেষণ করে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন—রাষ্ট্রীয় শাসন শুরুর পূর্বে বাংলার মুসলমান সমাজে ধর্মগত নয়, সংস্কৃতিগত প্রভাবই বেশি ছিল। আরবদের ইসলাম প্রচারের মূল দিকটি ধর্মগত না হয়ে সংস্কৃতিগত হওয়ার কারণে বাংলায় ইসলামের একটি দেশজ রূপ গড়ে ওঠে। এখানে ইসলামের মূল ধর্মীয় নীতি অক্ষুণ্ন রেখে সহজ মানবীয়তা, সাম্য ও প্রসারমান সংস্কৃতির আদর্শ প্রাধান্য পেয়েছে।[৬]

তেরো শতকের গোড়ার দিকে উত্তর ভারতে তুর্কি-মুসলিমদের রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হলেও বাংলার মানসে তারা কোনো ধরনের যোগসূত্র স্থাপন করতে পারেনি। বাংলার মুসলমান সমাজ উত্তর ভারতের সাংস্কৃতিক নেতৃত্ব গ্রহণে অনীহা প্রকাশ করেছে। ফলে বাংলার অবস্থানও তখন বরাবর দিল্লির বিরুদ্ধে গিয়েছে। দশম শতক থেকে বহির্বিশ্বে, বিশেষ করে এশিয়ায় তুর্কি-ইরানি শক্তির উত্থান মুসলিম জগৎ থেকে আরব প্রাধান্যকে ধ্বংস করে দিয়েছিল। 'আরবেতর' বা আরবের বাইরের জাতি হিসেবে তুর্কি ও ইরানিদের প্রতি আরবদের এক ধরনের অবজ্ঞাও ছিল। এর ফলে বাংলাকেও আরবরা তুর্কি-ইরানি শক্তির বিরুদ্ধে একটি ক্ষেত্র হিসেবে ব্যবহার করে। এ-কারণে

তুর্কি-আরব দ্বন্দ্ব এক সময় প্রবল হয়ে ওঠে। বিশেষ করে, তেরো শতকে ভারতে তুর্কি বিজয় এশিয়ায় আরবদের প্রভাব অনেকটাই বিপন্ন করে দেয়। এভাবে এশিয়ায় আরবরা ক্ষমতাচ্যুত হয়ে ভারত মহাসাগরের তীরে আত্মপ্রতিষ্ঠার সুযোগ খুঁজতে থাকে।[৭] তাছাড়া, তুর্কি-আরব দ্বন্দ্বের আরও একটা বড় কারণ ছিল সমুদ্রপথে আধিপত্য বিস্তার। তেরো শতকে ভারতে তুর্কি বিজয়ের ফলে আরবদের এই আত্মপ্রতিষ্ঠার লড়াই বিপন্ন হয়ে যায়। বিপরীত আদর্শসম্পন্ন এবং বিপরীত পথে আগত এই দুই জাতির দ্বন্দ্বও তীব্রতর হয়ে ওঠে। এছাড়া ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে সামুদ্রিক বাণিজ্যের নিয়ন্ত্রণ একচেটিয়াভাবে বাংলার হাতে ছিল। তুর্কি বিজয়ের কারণে আরব প্রভাব খর্ব হওয়ার দরুন তা দিল্লির নিয়ন্ত্রণে চলে যায়। এর ফলে বাংলার অর্থনৈতিক স্বার্থ ক্ষুণ্ন হয়। সামুদ্রিক বাণিজ্যের নিয়ন্ত্রণের জন্যে দিল্লি বাংলাকে নিজেদের নিয়ন্ত্রণে রাখতে চেয়েছে। কিন্তু বাংলার মানুষ নিজেদের অর্থনৈতিক স্বার্থের ব্যাপারে ঠিকই সচেতন থেকেছে। তারা দিল্লির কাছে নিজেদের স্বাতন্ত্র্য ও অধিকার সঁপে দিতে চায়নি। এভাবেই দিল্লির বিরুদ্ধে বিদ্রোহের মনোভাব বাংলার মুসলমান তথা বাঙালির মধ্যে জাগ্রত হয়। দিল্লির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ বাঙালি মুসলমান ও হিন্দুকে আত্মসচেতনও করেছে।[৮]

মুঘল আমলে বাঙালি মুসলমান সমাজ এশিয়ার মুসলিম সমাজের জ্ঞানতাত্ত্বিক জগতের সংস্পর্শে তেমন আসতে পারেনি। সাহিত্যও সৃষ্টি করতে পারেনি। এ-কারণে, আবু মহামেদ হবিবুল্লাহ বাংলার মুসলমানের শাসনের ইতিহাস কোথাও সেভাবে লিপিবদ্ধ হয়নি বলে আক্ষেপ প্রকাশ করেছেন। উত্তর ভারতের দর্শন, কাব্য ও ইতিহাস ইত্যাদি চর্চার প্রেরণা এসেছে ইরাক ও মধ্য এশিয়ার 'ইমিগ্র্যান্টদে'র (অভিবাসী) কাছ থেকে। দক্ষিণ ভারতে মনীষী যারা এসেছিলেন, তাঁদের সকলেই ছিলেন নবাগত। তাছাড়া অধিকহারে অভিবাসীদের আগমনের কারণে মুসলমানের ইতিহাস একটি শক্তিশালী অবস্থানে পৌঁছাতে পারেনি।[৯]

বাংলার সমাজব্যবস্থায় ও রাষ্ট্রপরিচালনায় স্বাদেশিক মনোভাব লক্ষ করা যায়। বাংলার সামাজিক বিকাশও 'বাঙালিত্ব'কে আশ্রয় করে এগিয়েছে। তাছাড়া, বাংলার রাষ্ট্র পরিচালনায় দেশজ অমুসলমানের সহযোগিতা ছিল। সমান অংশগ্রহণও ছিল।[১০] বাংলায় মুসলমানদের শাসনামল নিয়ে তেমন লিখিত দলিল না-থাকলেও রাজকার্যে অমুসলমানদের অবদান রাখার অবাধ সুযোগ ছিল। প্রাত্যহিক জীবনের এই ঘনিষ্ঠতা হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে পারস্পরিক ধর্ম ও সাংস্কৃতিক উপাদানের প্রতি শ্রদ্ধা ও অনুরাগেরও জন্ম দিয়েছে।

বাঙালি মুসলিম মানসে আরব প্রভাবিত 'Militant ধর্মীয়তা'র ছাপ লক্ষ করা যায়নি। বাংলার ধর্ম ও সংস্কৃতিতে ঔদার্য বিরাজমান থাকার সময়েই ইসলাম ধর্মের প্রচার ও প্রসার বেশি হয়েছে। বাংলায় ইসলাম প্রসারের ধরন নিয়ে হবিবুল্লাহর মন্তব্য—'ইসলাম প্রচারকদের প্রায় সকলেই এসেছে উত্তর ভারত দিয়ে ইরান, ইরাক ও মধ্য এশিয়া থেকে। কিন্তু বাংলার সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় আবহাওয়ায়, যেখানে সামাজিক exclusiveness ও উগ্র ধর্মীয়তার কোনও অস্তিত্ব নেই—তাদের প্রচার পদ্ধতি সেবার মধ্য দিয়ে শান্ত ব্যক্তিগত আবেদনের রূপ নিতে বাধ্য হলো।'[১১] অবশ্য বাংলায় ইসলামের প্রচার ও প্রসার সম্পর্কে নেতিবাচক কিছু মতও আছে। যেমন, উনিশ শতকের

শেষের দিকে রিজলি, বেভেরলি ও হান্টার প্রমুখ লেখকের মাধ্যমে এই মত প্রচারিত হয়—'বাংলার মুসলমান, বাংলার হিন্দু-সমাজের নিম্নস্তর থেকে উদ্‌ভূত—ইসলামের তলোয়ারের জোরে তারা মুসলমান হয়।'[১২] Richard M. Eaton তাঁর বিখ্যাত *The Rise of Islam and Bengal Frontier, 1204-1760* (1993) বইয়ে বাংলায় মুসলিম শাসনামলে 'বলপূর্বক ধর্মান্তরকরণে'র ('Religion of the Sword thesis') বিষয়টিকে অযৌক্তিক হিসেবে প্রমাণ করেছেন।[১৩] কাজী আবদুল ওদুদও (১৮৯৪-১৯৭০) তাঁর 'বাংলার মুসলমানের কথা' প্রবন্ধে যৌক্তিক বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে এই মতকে ('তরবারি তত্ত্ব') ভ্রান্ত হিসেবে প্রমাণ করেছেন। অবশ্য কাজী আবদুল ওদুদের পূর্বে হান্টার ও অন্যান্য লেখকের উল্লিখিত মতের প্রতিবাদ ব্যক্ত করেছেন মুর্শিদাবাদের নবাব-সরকারের দেওয়ান খোন্দকার ফজলে রাব্বি (১৮৪৮-১৯১৭)। উনিশ শতকের শেষ দশকে তাঁর লিখিত *হকিকত্-ই-মুসলমানান-ই-বাঙ্গালা* (১৮৯১) গ্রন্থে বাংলায় আগত বেশিরভাগ মুসলমানকে 'বহিরাগত' (আরব, ইরান, তুরান, মুঘল, পাঠানদের বংশধর হিসেবে অভিহিত করা) হিসেবে প্রমাণ করার চেষ্টা করা হয়েছে।[১৪] তবে খোন্দকার ফজলে রাব্বির মতামত যে যথার্থ নয় তা আধুনিক বাঙালি মুসলমান লেখকেরা প্রমাণ করেছেন। এম. এ. রহিম (১৯২১-১৯৮১) তাঁর *বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস* (প্রথম প্রকাশ, ১৯৮২; তৃতীয় পুনর্মুদ্রণ: ২০২২) গ্রন্থে প্রমাণ করেছেন যে, বাংলায় মুসলিম শাসনামলে বহিরাগত অভিজাত মুসলমানদের চেয়ে হিন্দু বা বৌদ্ধ ধর্মের নিপীড়নে ধর্মান্তরিত হওয়া দেশীয় মুসলমানদের সংখ্যা বেশি ছিল।[১৫] অসীম রায় তাঁর *The Islamic syncretistic tradition in Bengal* (1983) গ্রন্থে বাংলায় ইসলাম প্রচারে সাফল্যের ক্ষেত্রে পিরদের ভূমিকাকে বড়ো করে দেখেছেন।[১৬] অবশ্য, রিচার্ড ইটনও 'পিরবাদী' ভূমিকাকে অন্যভাবে উপস্থাপন করেছেন। অসীম রায় যেখানে ইসলামের প্রচার ও প্রসারে অস্থিতিশীল সমাজে পিরদের ভূমিকার ওপর গুরুত্ব দিয়েছেন, রিচার্ড ইটন সেখানে পিরদের বিভিন্ন সামাজিক উদ্যোগের বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়েছেন এবং তাঁদেরকে 'বাংলার কৃষি সীমান্তের প্রেরণা-সঞ্চারক' বলে অভিহিত করেছেন।[১৭] যাহোক, বাংলায় মুসলমানদের উৎপত্তি নিয়ে দ্বিমত আছে। তবে বাংলায় ইসলামের প্রচার ও প্রসারের ক্ষেত্রে সাম্য ও মানবিক জীবনবোধই প্রাধান্য পেয়েছিল—এ-ব্যাপারে কমবেশি সবাই একমত পোষণ করেছেন। এ-ক্ষেত্রে ফকির, দরবেশ, সুফি ও সন্তেরা মুখ্য ভূমিকা পালন করেছিলেন।[১৮]

বাংলায় ধর্ম ও রাজনীতিকে কেন্দ্র করে এক ধরনের সমন্বয়বাদী সমাজ ও সংস্কৃতি গড়ে ওঠার প্রবণতা দেখা যাচ্ছিল। এটা ক্রমে বাধাগ্রস্ত হয়। তেরো শতকে তা একেবারেই রুদ্ধ হয়ে পড়ে। ক্রমে বাংলা তার আত্মপ্রতিষ্ঠা হারায় ষোলো শতকে—পাঠান ও মুঘল প্রতিদ্বন্দ্বিতার মধ্য দিয়ে। ষোলো শতকের পাঠান-মুঘল যুদ্ধে মুঘলদের জয়লাভ বাংলার ইসলামের ঔদার্যকেও ক্ষুণ্ন করেছে। মুঘল সাম্রাজ্যের দীর্ঘ প্রভাব বাংলা কোনোভাবেই এড়াতে পারেনি। তবু তারা এর প্রতিবাদ করেছে, সহজে মুঘলদের গ্রহণ করেনি। আত্মরক্ষার প্রয়াস চালিয়েছে প্রতিনিয়ত।[১৯] অন্যদিকে, আরবদের সামুদ্রিক ক্ষমতা ষোলো শতকে পর্তুগিজদের হাতে চলে যাওয়ার কারণেও বাংলার আর্থিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক সকল ধরনের ভারসাম্য বিঘ্নিত হয়। এটিকে (সমুদ্রে আরবদের কর্তৃত্ব হারানো) প্রাবন্ধিক বাংলাকে মুঘল শাসনের কাছে নতি স্বীকার করার বড় কারণ হিসেবে

চিহ্নিত করেছেন এবং এর মধ্য দিয়ে আরবের সঙ্গে বাংলার যোগাযোগও বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।[২০] এর ফলে, উত্তর-ভারত ও মধ্য এশিয়ার সঙ্গে বাংলার মুসলমানদের অযাচিত সম্পর্ক গড়ে ওঠে। তবে তা কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া বাংলার জন্য নেতিবাচক পরিণতিই বয়ে আনে। বাংলার মুসলমানদের সঙ্গে হিন্দুদের যে একটা হৃদ্যতার সম্পর্ক তৈরি হয়েছিল তাতেও ভাঙন শুরু হয়।

দিল্লির সঙ্গে সঙ্গে বাংলার যুক্ত হওয়ার কিছু ইতিবাচক দিকও ছিল। এর মধ্য দিয়ে বাংলার 'প্রাদেশিক আত্মসর্বস্ব মানসিকতা' প্রসারিত হয়েছে এবং 'সাংস্কৃতিক চেতনা'ও বিস্তৃত হয়েছে। বাংলার হিন্দু ও মুসলমান সমাজের 'প্রগতিশীল ফার্সি সাহিত্যে'র সঙ্গেও পরিচয়ের সুযোগ তৈরি হয়।[২১] তবে, বাঙালি বর্হিজগতের সমাজ ও সংস্কৃতির সঙ্গে পুরোপুরি মানিয়ে নিতে পারেনি। এ-কারণে বাঙালি মুঘল শাসনকার্যেও সমভাবে অংশগ্রহণ করতে পারেনি। এ-জন্যেই বর্হিভারতীয় সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় আদর্শানুপ্রাণিত বাঙালি মুসলমানের কিছু অংশ 'স্বাদেশিকতার মর্যাদা' দাবি করেছিল।[২২] বাঙালি হওয়ার তাগিদ মুসলমান সমাজের সব স্তরেই আগে অনুভূত হয়েছিল। সে-কারণে, বাঙালি মুসলমান সমাজের সংহতি ও একাত্মবোধও প্রবল হয়েছিল। মুঘল শাসন সেখানে বাধার সৃষ্টি করে। বাঙালি মুসলমানের আত্মপরিচয়ের মূল সংকট তৈরি হয় এখানেই—

> বাঙালী হওয়ার যে তাগিদ মুসলমান সমাজের সব স্তরেই পূর্বে অনুভূত হয়েছিল এবং যার ফলে সমাজের সংহতি ও একত্ববোধ প্রবল হয়েছিল, সে তাগিদ না থাকাতে সামাজিক বাঁধনও শিথিল হয়ে পড়ল এবং ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রকারভেদ শ্রেণীনির্ভর হয়ে গেল। অভিজাতদের মানস রইল দিল্লী ও ইরানের দিকে নিবদ্ধদৃষ্টি, আর বাঙালীত্ব যাদের রক্তমাংসের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত সেই অনভিজাত মুসলমান উত্তর ভারতীয় সাংস্কৃতিক ঐশ্বর্যে চমৎকৃত হলেও প্রাদেশিক মানসিকতা ও সহানুভূতি বর্জন করার কোনও প্রয়োজনই অনুভব করল না।[২৩]

বলা যায়, সামাজিক বিপ্লবের কারণে তখন যে অভিজাত শ্রেণি তৈরি হয়, বাংলার মুসলমানের গতিপ্রকৃতির ধারা তাদের দ্বারাই পরিচালিত হতো। একদিকে চৈতন্যের শুদ্ধি আন্দোলন, অন্যদিকে মুঘলদের সময়ে সৃষ্ট এই অভিজাত শ্রেণির ইসলাম নিয়ে একঘেয়েমি মনোভাব ও সংকীর্ণতা বাংলার মুসলমানদের 'বাঙালি' হওয়ার প্রক্রিয়াকে ব্যাহত করে। ভাষার দৃষ্টান্তও এ-ক্ষেত্রে উল্লেখ করা যেতে পারে। মুঘল যুগে বাংলা ভাষা সাহিত্যানুরাগী অভিজাত মুসলমানদের কাছে সমাদর পায়নি। তাঁদের কাছে ফার্সি ভাষার অনুশীলনই ঐতিহ্যের ও আভিজাত্যের বিষয় হয়ে উঠেছিল।[২৪] এ-কথা বলা যায় যে, বাঙালি মুসলমান সমাজে বিভেদ সৃষ্টির বীজ মুঘল আমলেই সূচিত হয়েছিল। এই ভেদ সৃষ্টির কারণে প্রাবন্ধিক আবু মহামেদ হবিবুল্লাহ বাঙালি মুসলমান সমাজ 'দ্বিখণ্ডিত' হয়ে যায় বলে মনে করেন।[২৫]

মূলত, আবু মহামেদ হবিবুল্লাহ তাঁর 'বাংলার মুসলমান' প্রবন্ধে ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট থেকে বাঙালি মুসলমানের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ নিয়ে আলোচনা করেছেন। বাংলায় মুসলমানদের আগমন, ইসলামের প্রচার ও প্রসার, আরবদের সঙ্গে বাংলার সম্পর্ক, দিল্লির সঙ্গে তুর্কি ও ইরানের সম্পর্ক, দিল্লির সঙ্গে বাংলার বিরোধ, ইসলাম ধর্মের উদারতা ও হিন্দু-মুসলিম সম্প্রীতি, মুঘল শাসনামলে সৃষ্ট জাতিভেদ প্রভৃতি এ-প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়। আবু মহামেদ হবিবুল্লাহ বাংলার মুসলমান শাসনামলের ইতিহাস বিশ্লেষণ করে এ-অঞ্চলের মুসলমানদের 'বাঙালি' হওয়ার পথে

সৃষ্ট প্রতিবন্ধকতাগুলোও তুলে ধরেছেন। বাঙালি মুসলমানের আত্মপরিচয় সংকটের নেপথ্যে মুঘল শাসনামলের ভূমিকা যে সক্রিয় ছিল তা হবিবুল্লাহ দ্বিধাহীনভাবে বলেছেন।

২.২ বাঙালি মুসলমানের আত্মপরিচয়হীনতার কারণ অনুসন্ধান

বাঙালি মুসলমানের আত্মপরিচয়ের সংকট চিরদিনের। ইতিহাসচর্চার সীমাবদ্ধতার দরুন এই সংকটের মাত্রা দিন দিন বেড়েই চলছে। বিশেষ করে, নৃতাত্ত্বিক, ভৌগোলিক, রাষ্ট্রিক, সামাজিক প্রভৃতির লিখিত ইতিহাস না-থাকার জন্যে বাঙালি মুসলমানের আত্মপরিচয়ের সংকট তৈরি হয়েছে। আবু মহামেদ হবিবুল্লাহ মনে করেন, বাঙালি মুসলমানের ইতিহাসচর্চায় অনীহাই তার আত্মপরিচয়হীনতার অন্যতম কারণ। তিনি এ-বিষয়ে 'বাঙালী মুসলমানের ইতিহাস' নামক প্রবন্ধে যৌক্তিক আলোচনা করেছেন। এ-প্রবন্ধে তিনি কেবল বাঙালি মুসলমানের লিখিত ইতিহাস না-থাকার কারণই বিশ্লেষণ করেননি, কীভাবে বাঙালি মুসলমান ইতিহাস রচনার মধ্য দিয়ে আত্মপরিচয়ের ভিত্তি নির্মাণ করতে পারে তার উপায়ও বাতলে দিয়েছেন।

আবু মহামেদ হবিবুল্লাহ 'বাঙালি'র যে পরিচয় হাজার বছর ধরে নির্মিত হয়েছে তার তিরোধান সম্ভব নয় বলে মনে করেন। তিনি 'বাঙালী মুসলমানের ইতিহাস' প্রবন্ধে এই 'বাঙালিত্বের'ই ইতিহাস অনুসন্ধান করেছেন। লেখকের মতে, বাঙালিত্বের ইতিহাস অনুসন্ধানে অনেকগুলো প্রশ্নের উত্তর জানার প্রয়োজন রয়েছে—'[...] কবে হতে আমরা বাঙালী বলে নিজেকে চিনেছি? কোন্ প্রক্রিয়ার ফলে এখানকার মুসলমান উত্তরাপথের সাংস্কৃতিক চিন্তা থেকে আলাদা হয়ে আত্মপ্রতিষ্ঠায় সচেষ্ট হয়ে উঠল? উত্তর ভারতের ও বাঙালী মুসলমানের মধ্যে অর্থনৈতিক বিবর্তনের প্রভেদ কেন? আকৃতিগত পার্থক্যেরই বা কী কারণ?।'[২৬] বাঙালি মুসলমানের আত্মপরিচয়ের স্বরূপ বোঝার জন্যেই উপর্যুক্ত প্রশ্নাবলির উত্তর জানার প্রয়োজন রয়েছে। কারণ, আত্মপরিচয় সম্বন্ধে সচেতন না-হলে সাংস্কৃতিক আত্মনিয়ন্ত্রণ অর্থবহ হয়ে ওঠে না। রাজনৈতিক স্বাতন্ত্র্যকে রক্ষা করার জন্যে প্রত্যেক জাতির সাংস্কৃতিক ভিত্তির প্রতি সচেতন হওয়ার প্রয়োজন রয়েছে।[২৭] বাঙালি মুসলমানের আত্মপরিচয়ের স্বরূপ অনুসন্ধানের তাগিদে বাংলার মুসলমানের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসকে জানার দরকার আছে। এ-ক্ষেত্রে লেখক বাংলায় মুসলমান যুগের ইতিহাসচর্চাকে প্রাধান্য দিয়েছেন। সেই সঙ্গে 'প্রাক মুসলিম বাংলার ইতিহাসও মুসলমানের পক্ষে সমান গুরুত্বপূর্ণ। কারণ কোনও কিছুই অতীতকে এড়াতে পারে না।'[২৮]

প্রাচীন বাংলার ইতিহাসের দিকে আলোকপাত করলে দেখা যায়, বাংলায় মুসলমান শাসনামলের ইতিহাস খুবই অবহেলিতভাবে বর্ণিত হয়েছে। মুসলমান শাসনামলের তথা মধ্যযুগের প্রায় ৮০০ বছরের ইতিহাস আলোচনায় যথার্থ স্থান পায়নি। অনেকক্ষেত্রে ভুল ইতিহাসও বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু বাঙালি মুসলমান, এমনকি বাঙালি হিন্দুর আত্মপরিচয়ের ভিত্তি নির্মাণের জন্যে এই আটশত বছরের ইতিহাস জানার প্রয়োজন রয়েছে। কারণ, 'আজকের বাঙালী মুসলমানের সমাজ ও সাংস্কৃতিক বিবর্তনের কাহিনি অজানা তো বটেই, বাঙালী-হিন্দুর আত্মপরিচয়ও অসম্পূর্ণ থেকে যায় যতদিন না মধ্যযুগের এই প্রায় ৮০০ বছরের বিবর্তনীয় ধারাগুলি সুস্পষ্ট হয়।[২৯] আবু

মহামেদ হবিবুল্লাহ বাংলার ইতিহাসে বাঙালি মুসলমান শাসনামলের তেমন গুরুত্ব না-পাওয়ার যে প্রসঙ্গ উপস্থাপন করেছেন তা নিয়ে আরও অনেক ইতিহাসবিদ ও লেখক একই মন্তব্য করেছেন। যেমন, আবদুল হক তাঁর 'বাঙালী মুসলমান : ভূমিকা ও নিয়তি' প্রবন্ধে বাংলার ইতিহাসকে 'খণ্ডিত ও অসম্পর্ণ' বলে অভিহিত করে মন্তব্য করেছেন—'[...] বাঙালী মুসলমানের রাষ্ট্রীয় ইতিহাস প্রধানতঃ বাংলায় আগত অবাঙালীদের রাষ্ট্রীয় ইতিহাসের অঙ্গ মাত্র, এমনকি সে ইতিহাসে লীন। বাংলার ইতিহাস তাই আর যা-কিছু হোক, বাঙালী মুসলমানের ইতিহাস নয়।'[৩০]

বাংলার ইতিহাস রচনায় ঐতিহাসিকেরা 'মুঘল আমল'কে বেশি প্রাধান্য দিয়েছেন। ইংরেজ মারফত বাঙালিরা মুঘল শাসকদের শক্তি ও ঐশ্বর্যের সঙ্গে বেশি পরিচিত হওয়ার কারণে তারা মনে করে মুসলমানের সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক বিকাশের দ্বার মুঘল আমলেই উদ্ঘাটিত হয়েছে।[৩১] এ-রকম ধারণা বাংলার মুসলমান সমাজ সম্বন্ধে 'খাপছাড়া' (খণ্ডিত) মনোভাবের সৃষ্টি করেছে। প্রাবন্ধিক এ-সম্পর্কে বলেছেন—'কিন্তু ভুলে যাই, কারণ জানবার সুযোগ আজও সৃষ্টি হয় নাই, যে প্রায় ৩০০ বছর ধরে এদেশে একটা স্বাধীন সমৃদ্ধ মুসলিম রাষ্ট্র ছিল মুঘলদের পূর্বে এবং যে রাষ্ট্র ছিল উক্ত ভারতের মুসলিম সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহপ্রসূত।'[৩২] বাংলার হিন্দু মুসলমানের ভাষা, দুই ধর্মের ঔদার্য ও সমন্বয়ের চেষ্টা মুঘল শাসক সম্রাট আকবরের সময় (শাসনকাল: ১৫৫৬-১৬০৫) থেকে নয়, আরও ১০০ বছর আগেই শুরু হয়েছিল বলে মনে করা হয়। বাঙালি মুসলমানেরা তা অবগত নয়। এমনকি রক্ত সম্পর্কে বাঙালিরা যে তিব্বতীয় মঙ্গলীয়-দ্রাবিড়ীয় অস্ট্রিক জাতির কাছাকাছি তাও তারা ভুলে যায়।[৩৩]

বাংলার মুসলিম আমলের কোনো লিখিত ইতিহাস নেই। এ-জন্যে মুসলমান শাসনামলের নথিপত্র, ব্যক্তিগত পত্র ও অন্যান্য উপাত্ত আবিষ্কার করে তার স্বরূপ উদ্ঘাটন করা প্রয়োজন। কিন্তু বাঙালি মুসলমানরা হিন্দুদের তুলনায় ইতিহাস সংগ্রহ ও রক্ষায় পিছিয়ে আছে। তারা এ-বিষয়ে সচেতনও নয়। আবু মহামেদ হবিবুল্লাহ মনে করেন, এ-ধরনের মানসিকতা মুসলমানদের ইতিহাস জানার ক্ষেত্রটিকে আরও সংকীর্ণ করে দিয়েছে।[৩৪] তাছাড়া, ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে ধৈর্য ও সাধনা সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ, যা বাঙালি মুসলমানের মধ্যে নেই।

আবু মহামেদ হবিবুল্লাহ মুসলিম বাংলার সামাজিক ইতিহাসকে বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন। কারণ, সামাজিক ইতিহাসের মধ্যে একটা জাতির নাড়ি-নক্ষত্রের খবর পাওয়া যায়। তিনি মুসলিম বাংলার সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ইতিহাসের গুরুত্ব উপলব্ধি করে মন্তব্য করেছেন—'[...] রাজবংশের উত্তানপতন ও যুদ্ধবিগ্রহের বর্ণনা ইতিহাসের কাঠামো মাত্র, তার প্রাণ প্রতিষ্ঠা হয় মানুষের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বিবর্তনের ধারা বিশ্লেষণে। কিন্তু মুসলিম বাংলার ইতিহাসে সে প্রাণ প্রতিষ্ঠা দূরের কথা, স্থূল কাঠামোরও অনেকাংশ অসম্পূর্ণ।'[৩৫]

আবু মহামেদ হবিবুল্লাহ 'বাঙালি মুসলমানের ইতিহাস' প্রবন্ধে জোরালোভাবে বলেছেন যে, বাঙালি মুসলমানদের উল্লেখ করার মতো ইতিহাসচর্চার কোনো ক্ষেত্র নেই। সমৃদ্ধ ইতিহাস থাকার পরেও চর্চার অভাবে বাঙালি মুসলমানের পরিচয়ই এখন সংকটের মুখে। প্রাবন্ধিক বারবার বাঙালি

মুসলমানদের ইতিহাসচর্চার ক্ষেত্রগুলো কীভাবে আরও সমৃদ্ধ করে তোলা যায় সেদিকেই আলোকপাত করেছেন। আর মুসলিম বাংলার কাঠামো নির্মাণের ইতিহাস নয়, প্রয়োজন মানুষের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বিবর্তনের ইতিহাস—এরূপ ইতিহাস নির্মাণের মধ্য দিয়েই একটা জাতির আত্মপরিচয়ের ভিতকে চিহ্নিত করা যায়।

২.৩ বাঙালি মুসলমানের সাহিত্যিক, সাংস্কৃতিক ও সামাজিক আত্মপরিচয়ের স্বরূপ

'বাঙালী মুসলমানের সাহিত্য, সংস্কৃতি ও সমাজ' নামক প্রবন্ধে আবু মহামেদ হবিবুল্লাহ বাঙালি মুসলমানের সাহিত্যিক, সাংস্কৃতিক ও সামাজিক আত্মপরিচয়ের সংকটের চিত্র লিপিবদ্ধ করেছেন। সেই সঙ্গে ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করে বাঙালি মুসলমানের আত্মপরিচয়ের সংকট থেকে উত্তরণের উপায় নির্দেশ করেছেন। বিভিন্ন দৃষ্টান্ত দিয়ে এটা প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন যে, বাঙালি সংস্কৃতিতে মুসলমানের দান কম নয়। বাঙালি মুসলমানের স্বতন্ত্র মানসিকতা, হৃদয়ভিত্তি, সুখ-দুঃখ, আশা-আকাঙ্ক্ষা ও সংস্কৃতিচেতনা আছে এবং সাহিত্যে তার যথার্থ রূপ দেওয়ার প্রয়োজনও রয়েছে। এ-কারণে, মুসলিম জনসাধারণের মূল্যবোধ, কৃষকের জীবন, ধ্যান-ধারণা, আচার-ব্যবহার, তৌহিদের বাণী ও সংস্কারকে সাহিত্যে রূপ দেওয়াও বর্তমানে প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। কেননা, সাহিত্যের চারণভূমি বাস্তব সমাজে এবং বাংলা সাহিত্যের ভিত্তি বাংলাভাষী বাঙালি সংস্কৃতির অন্তর্ভুক্ত হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে বাঙালি সমাজ।

বাংলা সাহিত্যে বাঙালি মুসলমানের আগমন খুব বেশি আগে হয়নি। পঞ্চাশ বছর আগেরকার সময়েও শিক্ষিত শ্রেণির সংস্কৃতিচর্চার ভাষা ছিল ফার্সি ও উর্দু।[৩৬] আর আধুনিক বাঙালি মুসলমানের সাহিত্যচর্চায় ঐতিহ্যের অভাব রয়েছে এবং সংস্কৃতির ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতাও নেই। এই ধারাক্রম শুরু হয়েছিল মধ্যযুগে। সে-সময় মুসলমানরা সাহিত্যচর্চায় আত্মশক্তি খুঁজে পাননি এবং নতুন সংস্কৃতি সম্পর্কে সার্বিকভাবে সুষ্ঠু চেতনাও তাদের মনে তখন জাগেনি। মধ্যযুগে মুসলমান রচিত কাব্যসমূহে যে মননশীলতার পরিচয় পাওয়া যায় তার সঙ্গে 'বিশুদ্ধ' ইসলামি ভাবের ঘনিষ্ঠতা কম ছিল—এ-সাহিত্যের আখ্যান, প্রকাশভঙ্গি ও ভাবসম্পদ বাঙালি, হিন্দু, বৌদ্ধ, বৈষ্ণব ভাবসমৃদ্ধ মধ্যযুগের বাংলা কাব্য থেকে ভিন্ন নয়।[৩৭]

আবু মহামেদ হবিবুল্লাহ সাহিত্যক্ষেত্রে বাঙালি মুসলমানের আবির্ভাবকে আকস্মিক বলে মনে করেন। এই আকস্মিকতার পেছনে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও বৈপ্লবিক শক্তি ক্রিয়াশীল ছিল।[৩৮] রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক কারণেই বাঙালি মুসলমান আধুনিক বাংলা সাহিত্যের অঙ্গন থেকে বিচ্ছিন্ন থাকতে বাধ্য হয়েছিল। ভারতে মুসলিম রাজনৈতিক আধিপত্যের সময়ে মুসলমান শাসক শ্রেণির সংস্কৃতি ছিল 'নাগরিক'। আর এই 'নাগরিক' সংস্কৃতি ফার্সি ও উর্দু ভাষাকে আশ্রয় করে গড়ে উঠেছিল। অন্যদিকে, মুঘল শাসনামলের পর থেকেই বাংলার সঙ্গে উত্তর ভারতের রাজনৈতিক দূরত্ব সৃষ্টি হয়। এরপর পলাশির প্রান্তরে বাংলার সংস্কৃতির ধারা রুদ্ধ হয়ে পড়ে।[৩৯]

১৭৫৭ থেকে ১৮৫৮ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত সময়ে বাঙালি মুসলমানের জীবনে নানান রকম দুর্যোগ নেমে আসে। ১৭৬৫ খ্রিষ্টাব্দে রবার্ট ক্লাইভ দিল্লির বাদশাহ শাহ আলমকে বার্ষিক ২৬ লাখ টাকা

রাজস্বদানের প্রতিশ্রুতিতে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার রাজস্ব আদায়ের ক্ষমতা গ্রহণ করে।[৪০] কিন্তু রাজস্ব আদায়ের নামে চলে অবাধ লুটপাট এবং এই লুটপাটের চরম পরিণতি ১১৭৬ বঙ্গাব্দের মন্বন্তর। এই মন্বন্তরের কারণে 'ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি' রাজস্ব আদায়ের ব্যাপারে পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু করে। এর ফলস্বরূপ ১৭৯৩ খ্রিষ্টাব্দে 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত' আইন চালু করা হয়। এই সামগ্রিক পরিপ্রেক্ষিতে মুসলমানদের আর্থিক অবস্থার ব্যাপক রদ-বদল ঘটে। ভূমিনির্ভর মুসলিম সমাজের সর্বনাশের আরেকটি কারণ হচ্ছে ১৮২৮ খ্রিষ্টাব্দে 'লাখেরাজ সম্পত্তি'র[৪১] বা Resumption procedings বাজেয়াপ্তকরণ। এভাবে বাঙালি মুসলমানের জীবনে ইংরেজ শাসনের ধাক্কা তার অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবনকে বিপর্যস্ত করে তুলেছিল।[৪২] এরপর 'সিপাহী বিদ্রোহে'র (১৮৫৭) আঘাত বাংলার মুসলমানকে অধঃপতনের স্তরে নিয়ে যায়। এর দুটো উল্লেখযোগ্য প্রভাব রয়েছে। প্রথমত, গ্রামীণ জীবনধারার সঙ্গে বাঙালি মুসলমানের ঘনিষ্ঠ পরিচয়লাভ ঘটে; দ্বিতীয়ত, বাঙালি মুসলমানের সাহিত্য ও সংস্কৃতিচর্চায় ফার্সি ভাষার প্রভাব কমে যায়। ফলে, উনিশ শতকের মাঝামাঝিতে মুসলমান সংস্কৃতির বাঙালি হওয়ার প্রচেষ্টা লক্ষ করা যায়। এর পরিণতি হিসেবে উর্দু সাহিত্য ও সংস্কৃতি থেকে বাংলা সাহিত্য বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।[৪৩]

বাঙালি মুসলমানের বাংলা সাহিত্যে আত্মপ্রতিষ্ঠিত হওয়ার পেছনে যে বিলম্ব দেখা যায় তার আরও একটা উল্লেখযোগ্য কারণ আছে—বাঙালি হিন্দুর তুলনায় এ-সমাজে মধ্যবিত্তশ্রেণির বিকাশ দেরিতে হয়েছে। অবশ্য, এর পেছনে অর্থনৈতিক আনুকূল্যের বিষয়টি জড়িত ছিল। ভারতে মুসলিম শাসন থেকে ব্রিটিশ শাসন—দুই যুগেই হিন্দুর আর্থিক স্থায়িত্ব অক্ষত ছিল। কিন্তু মুসলমানের ক্ষেত্রে তা হয়নি। বাঙালি মুসলমান ব্রিটিশ শাসনের (শুরুর দিকে) প্রায় একশত বছর আর্থিক আনুকূল্য পায়নি। ফলে, বাঙালি মুসলমান সমাজে মধ্যবিত্তশ্রেণির বিকাশও দেরিতে হয়েছে। তাছাড়া, হিন্দু মধ্যবিত্তশ্রেণি গঠন যত সহজ হয়েছিল, মুসলমান মধ্যবিত্তশ্রেণি তত সহজে গড়ে ওঠেনি।[৪৪] প্রাবন্ধিক বাঙালি মুসলমান সমাজে মধ্যবিত্তশ্রেণির বিকাশ বিলম্বিত হওয়ার জন্যে এ-সমাজের পরিবর্তনবিমুখ মনোভাবকেও দায়ী করেছেন।[৪৫] তবে, এটা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, বাঙালি হিন্দু ব্রিটিশ রাজশক্তির পৃষ্ঠপোষকতা যতটা পেয়েছে বাঙালি মুসলমান ততটা পায়নি।

উনিশ শতকের শেষদিকে ইংরেজি শিক্ষার প্রভাবে মুসলিম সম্প্রদায়ের আত্মসচেতনতা জাগ্রত হয়। নবজাগ্রত এক মধ্যবিত্তশ্রেণির মধ্যে অনিবার্যভাবে জন্ম নেয় আত্মপরিচয়-জিজ্ঞাসা—তার সঙ্গে বিভিন্ন মানসিক জটিলতাও বাঙালি মুসলমানকে আক্রান্ত করে। হিন্দু সমাজের সঙ্গে মুসলমান সমাজের সাংস্কৃতিক ভিন্নতারও সৃষ্টি হয়। পাশ্চাত্য শিক্ষার সৌজন্যে দুই সমাজের এগিয়ে যাওয়া ও পিছিয়ে পড়াকে কেন্দ্র করে টানাপোড়েন শুরু হলে বাংলার নিজস্ব সংস্কৃতির সঙ্গে যে সংযোগ শুরু হয়েছিল মুসলিম শাসনামলে, ব্রিটিশদের রাজনৈতিক স্বাতন্ত্র্যের প্রভাবে তা বন্ধ হয়ে যায়। ইংরেজ আমলে বাঙালি মুসলমানের অর্থনৈতিক ধারাবাহিকতা ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। তাছাড়া, এ-সমাজ ব্রিটিশ শাসনের রাজনৈতিক দূরভিসন্ধির মধ্যেও পড়েছে। এ-কারণে, 'ইংরেজ বিভেদনীতি'কে বাঙালি মুসলমান সমাজের স্বাভাবিক বিকাশ না-হওয়ারও একটা

অন্তরায় হিসেবে গণ্য করা হয়। আর 'বিভেদনীতি'র মধ্যে সে-সমাজের বিকাশ যে 'সমন্বয়ী' হবে না তা স্বাভাবিক হিসেবে ধরে নেওয়া যায়।[৪৬] যাহোক, রাজনৈতিক প্রভাবের ('ইংরেজ বিভেদনীতি') কারণেই বাংলার নিজস্ব সংস্কৃতির সঙ্গে বাঙালি মুসলমানের যে পরিচয় হয়েছিল তার ধারাবাহিকতায় ছেদ পড়ে।

মুসলমানের সাহিত্যচর্চাকে অনেকে 'ইসলামীয়তা'র নামে অভিহিত করতে চান। আবু মহামেদ হবিবুল্লাহ এর বিরোধিতা করেছেন। এ-ক্ষেত্রে বাঙালি মুসলমান রচিত সাহিত্যে 'ইসলামি ভাব' বা 'ইসলামীয়তা' আছে কিনা তা যাচাই করে দেখার প্রয়োজন রয়েছে। তাছাড়া, সাহিত্যে 'ইসলামীয়তা' বলতে কী বোঝায় বা ইসলামি সংস্কৃতি বলতে কী বোঝায় তা জানা আবশ্যক। 'ইসলামীয়তা' বলতে যদি এ-ধর্মের চেতনাগত ও আদর্শগত দিক বোঝানো হয়, যেমন— 'একেশ্বরবাদ, সাম্য ও আন্তর্জাতিকতা, আত্মপ্রত্যয়, বিশ্বাস ও কর্মের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য যোগ, আশাবাদী সাংসারিকতার মধ্যে আত্মোপলব্ধি এ সব তত্ত্ব মোটেই জটিল নয় এবং সাহিত্যে রূপ পাওয়ার সম্ভাবনা সম্বন্ধে সন্দেহ বা বিরোধও নেই।'[৪৭] তাছাড়া, সংস্কৃতি জাতিগত ও দেশগত। বাঙালি মুসলমানের একেশ্বরবাদ, সাম্য ও আন্তর্জাতিকতা, আত্মপ্রত্যয়, বিশ্বাস ও কর্মের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য যোগ একটি সুস্পষ্ট একতা দান করেছে। কিন্তু এই ধর্মীয় মূলতত্ত্বগুলোই ভারতের চিন্তাধারার মূলে প্রোথিত। কেননা, ভারতের সংস্কৃতি বলতে হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন, খ্রিষ্টান, ইসলাম প্রভৃতি ধর্মানুপ্রাণিত উপাদানেরই সমষ্টি।[৪৮] তাই, বাঙালি মুসলমান তার সাহিত্যিক ঐতিহ্য (ভারতীয় ও বাঙালি) থেকেই ধর্মীয় অনুভূতি বা তত্ত্বকে সাহিত্যে তুলে ধরেছে। এটাও মনে রাখতে হবে, বাঙালি মুসলমানের মনের বিরহী চেতনাও বাংলার নিজস্ব ঐতিহ্য থেকে এসেছে, ইসলামি ভাব থেকে নয়।[৪৯]

আবু মহামেদ হবিবুল্লাহ বাংলা সাহিত্যে বাঙালি মুসলমানের পিছিয়ে থাকার যেসব কারণ চিহ্নিত করেছেন (মুসলমান সমাজের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দুরবস্থা, ব্রিটিশ শাসনের ভেদনীতি, মুসলমান মধ্যবিত্তশ্রেণির বিকাশে বিলম্ব হওয়া প্রভৃতি) তার বাইরেও গুরুত্বপূর্ণ কিছু বিষয় রয়েছে। প্রাবন্ধিক ও চিন্তক কাজী আবদুল ওদুদ তাঁর 'বাঙ্গালী-মুসলমানের সাহিত্য সমস্যা' প্রবন্ধে মুসলমান সমাজে সাহিত্যের বিকাশের পথে বেশকিছু বাধাকে চিহ্নিত করেছেন। এ-ক্ষেত্রে তিনি মুসলমান সমাজের দিকেই দৃষ্টি দিয়েছেন। কাজী আবদুল ওদুদ মনে করেন, বাঙালি মুসলমানের জীবনায়োজনে মারাত্মক ত্রুটি রয়েছে। জীবনকে যাপনের ক্ষেত্রে সে একটা নির্দিষ্ট সীমানা নির্ধারণ করে দিয়েছে এবং এটা তার চিন্তাভাবনাকেও সীমাবদ্ধ করে রেখেছে। কারণ, বাইরে থেকে বিধি-নিষেধ চাপিয়ে দিলে তা ব্যক্তির চিত্তের স্বাভাবিক বিকাশকে বাধাগ্রস্ত করে। এ-কারণে তিনি সাহিত্যচর্চা ও বিকাশের জন্যে বাঙালি মুসলমান সমাজে জ্ঞানচর্চার পরিবেশ সৃষ্টির ওপর গুরুত্বারোপ করেছেন। বাংলার মুসলমান সমাজের অন্তরে গূঢ় জীবনরসের সঞ্চার করা জরুরি—এটি তার ভেতরেই সঞ্চিত আছে। কেবল প্রয়োজন পূর্ণাঙ্গ বিকাশের। সর্বোপরি, সাহিত্যের বিকাশের জন্যে 'সুব্যবস্থিত সমাজ-জীবনের, জীবনের বহু ভঙ্গিমতাকে যথেষ্ট যত্ন ও শ্রদ্ধা নিয়ে লালন করবার' প্রয়োজন রয়েছে।[৫০] মূলত, বাঙালি মুসলমানের সাহিত্য সমস্যা

নিরূপণে হবিবুল্লাহ ও ওদুদের মধ্যে দৃষ্টিভঙ্গিগত পার্থক্য লক্ষণীয়—হবিবুল্লাহ ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে বাঙালি মুসলমানের সাহিত্য সমস্যাকে দেখেছেন; আর ওদুদ বাঙালি মুসলমান সমাজের মধ্যেই এই সমস্যাকে চিহ্নিত করেছেন।

যাহোক, বাঙালি মুসলমানের সাহিত্যে পিছিয়ে থাকার মূল কারণ হচ্ছে—সে সমাজ এখনও সংস্কৃতির অপরিহার্য অঙ্গ হয়ে ওঠেনি। যখন বাঙালি মুসলমান সমাজে সমষ্টিগত চেতনার প্রকাশ হবে, তখন সাহিত্যেও তার প্রতিফলন লক্ষণীয় হবে। আর বাঙালি মুসলমানের আত্মপরিচয় নির্মাণের তাগিদেই বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে তার জোরালো ভূমিকা পালন করার প্রয়োজন রয়েছে।

২.৪ বাঙালি মুসলমানের সাংস্কৃতিক আত্মনিয়ন্ত্রণ

'সংস্কৃতি' একটি বিশদ ধারণার নাম। যেকোনো জাতির সাংস্কৃতিক পরিচয়ের সঙ্গে সেই জাতির ভাষা, সাহিত্য, শিল্প, সমাজব্যবস্থা, খাদ্যাভাস, চিন্তাপ্রণালি, জীবনাভ্যাস ও জীবনানুশীলন জড়িত। বাঙালি জাতির সাংস্কৃতিক পরিচয়ও এসবের মধ্যেই নিহিত। আবু মহামেদ হবিবুল্লাহ তাঁর 'বাঙালী মুসলমানের সাংস্কৃতিক আত্মনিয়ন্ত্রণ' নামক প্রবন্ধে মোট তিনটি পর্বে বাঙালি মুসলমানের সাংস্কৃতিক আত্মনিয়ন্ত্রণ নিয়ে আলোচনা করেছেন। প্রথম পর্বে আলোচিত হয়েছে সংস্কৃতি কী এবং কীভাবে নির্মিত হয় সে সম্পর্কিত ধারণা; ভাষা ও ধর্মীয় অবস্থান বিবেচনায় বাঙালি সংস্কৃতির স্বরূপ এবং বাঙালির আত্মপ্রতিষ্ঠার উপায় কী হবে তার আলোচনাও প্রথম পর্বে করেছেন। দ্বিতীয় পর্বে বাঙালি মুসলমান বাঙালি সংস্কৃতির সঙ্গে একাত্ম হওয়ার ক্ষেত্রে ইসলামের মূলধারা থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার আশঙ্কা যে অমূলক সে বিষয়ে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। প্রবন্ধের শেষ পর্বে বাঙালি সংস্কৃতিকে কীভাবে সমৃদ্ধ করা যায় তার উপায়সমূহ বর্ণনা করা হয়েছে এবং বাঙালি মুসলমানের নিজেদের আত্মপ্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে অন্য সকলের আগে নিজেদের কর্তব্য যে বেশি সে সম্পর্কেও যৌক্তিক আলোচনা করা হয়েছে।

বাঙালি মুসলমানের আত্মপরিচয় নির্মাণের তাগিদেই তার সাংস্কৃতিক আত্মনিয়ন্ত্রণ প্রয়োজন। বাঙালি মুসলমান যে সংস্কৃতির ঐতিহ্য বহন করছে এবং বর্তমানে যে-সংস্কৃতিতে অবগাহন করছে, এ-দুই সংস্কৃতির মধ্যে সমন্বয় না-হলে তার জীবনের পূর্ণাঙ্গ ছবি 'বাঙালি সংস্কৃতি'তে ফুটে উঠবে না। সংস্কৃতির নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে বাঙালি মুসলমান যদি প্রতিবেশী হিন্দুর সঙ্গে সমতাবিধান না-করতে পারে তবে সে মানসিক হীনাবস্থার (Inferiority Complex) মধ্যে পড়বে এবং তার আত্মপরিচয়ের সংকট আরও ঘনীভূত হবে। এ-বিষয়টি প্রধানত বিবেচনায় রেখে আবু মহামেদ হবিবুল্লাহ বাঙালি মুসলমানের আত্মপরিচয়ের স্বরূপ বোঝা ও তার ভিত্তি দৃঢ় করার জন্যে 'সাংস্কৃতিক আত্মনিয়ন্ত্রণ'কে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছেন।

'সাংস্কৃতিক আত্মনিয়ন্ত্রণ' বলতে সাধারণত নিজের সংস্কৃতির ওপর (যে সংস্কৃতিতে কোনো জাতি অবগাহন করছে) যৌক্তিক নিয়ন্ত্রণ সৃষ্টির ক্ষমতাকে বোঝানো হয়। অর্থাৎ, নিজের সংস্কৃতিতে 'অপর' হয়ে না-থেকে 'আত্ম' হওয়া। বাঙালি মুসলমানের সংস্কৃতি হচ্ছে 'বাঙালি সংস্কৃতি'। এ-সংস্কৃতিতে বাঙালি হিন্দুর দান বেশি বলে তাকে হিন্দু প্রভাবিত বলে মনে করা হয়।[৫১] কারণ,

বাঙালি মুসলমান জীবনের পরিচয় এ-সংস্কৃতিতে তেমন পাওয়া যায় না। এ-জন্যে, বাঙালি মুসলমানের নিজের জীবনের আচার, ধর্মীয় ঐতিহ্য তথা ইসলামি ভাবধারা ও তার সংস্কৃতির অন্যান্য বিষয় 'বাঙালি সংস্কৃতি'তে সংযোজন করার প্রয়োজন রয়েছে। বাঙালি মুসলমানের সংযোজিত সংস্কৃতির চর্চা যখন সংখ্যাগরিষ্ঠের কাছে গ্রহণযোগ্যতা পাবে তখনই কেবল সে 'সাংস্কৃতিক আত্মনিয়ন্ত্রণে'র দাবি করতে পারবে। বাঙালি মুসলমানের এই 'সাংস্কৃতিক আত্মনিয়ন্ত্রণে'র সার্থকতা কোথায়? এর জবাবে হবিবুল্লাহ বলেছেন—'রাজনৈতিক আত্মপ্রতিষ্ঠাই তো চরম উদ্দেশ্য নয়—সমগ্র ব্যবহারিক ও মানসিক জীবনকে প্রয়োজন মতো সংস্কৃত ও উন্নত করার উপায় মাত্র এবং যাকে সংস্কৃতি বলি তার সুষ্ঠু বিকাশই এ আত্মপ্রতিষ্ঠার একমাত্র সার্থকতা'।[৫২] আবু মহামেদ হবিবুল্লাহ বাঙালি মুসলমানের এই 'সাংস্কৃতিক আত্মনিয়ন্ত্রণ' কীভাবে প্রতিষ্ঠা করা যায় সে-বিষয়ে বিশ্লেষণধর্মী আলোচনা করেছেন। তাঁর এই আলোচনায় অন্যান্য বিষয়ও প্রসঙ্গক্রমে হাজির হয়েছে।

আবু মহামেদ হবিবুল্লাহ তাঁর 'বাঙালী মুসলমানের সাংস্কৃতিক আত্মনিয়ন্ত্রণ' নামক প্রবন্ধের প্রথম পর্বে 'সাংস্কৃতিক সমজাতিত্ব' নিয়ে বিশ্লেষণধর্মী আলোচনা করেছেন। এ-ক্ষেত্রে 'সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য' কী এবং বাংলার সাংস্কৃতিক সমজাতিত্ব কীভাবে নির্মিত হয়েছে তার স্বরূপ পর্যালোচনা করেছেন। কোনো দেশের বা সমাজের 'সাংস্কৃতিক সমাজীয়তা' তিনটি বিষয় দিয়ে নির্দিষ্ট হয়—ভাষা, ঐতিহাসিক ট্র্যাডিশন ও ধর্ম। এ-তিনটির মধ্যে ভাষাই প্রধান অনুষঙ্গ। এর বাইরে আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় রয়েছে—জাতিগত উৎপত্তি। 'জাতিগত উৎপত্তি' বা এর প্রভাবকে উল্লিখিত তিনটির কোনোটিই মুছতে পারে না। ধর্মকে বাদ দিয়েও ভাষা ও জাতিগত সম্বন্ধ (Racial Kinship) অনুসারে বাংলার 'সাংস্কৃতিক সমজাতিত্ব' (Homogeniety)-এর ব্যাপারে একমত হওয়া যায়।[৫৩] বাঙালি জাতির দুটি প্রধান উল্লেখযোগ্য অংশ হচ্ছে হিন্দু ও মুসলিম জাতি এবং ভাষার ক্ষেত্রে উল্লেখ্য পূর্ববঙ্গের বাংলা ভাষা ও পশ্চিমবঙ্গের বাংলা ভাষা। প্রাবন্ধিক ভাষা ও জাতিগত সম্বন্ধ অনুসারে 'বাংলার সমজাতিত্ব' বিচার করেছেন। এ-ক্ষেত্রে তাঁর বক্তব্য হচ্ছে—'[...] যাঁরা বাঙালী মুসলমানের রক্তে তুর্কী-ইরানী প্রাধান্য দেখবার পক্ষপাতী তাঁরা অংশ দিয়ে সমগ্রের বিচার করেন।'[৫৪] বাংলায় মুসলমানদের শাসনামল মুঘল শাসনের বহু পূর্বে শুরু হয়েছে। বাংলায় অনেক আগে থেকেই নানানভাষী সুফি প্রচারকরা এ-অঞ্চলে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির কথা বলেছেন। বাংলায় ইসলাম প্রচারের ইতিহাসও তার পক্ষে সাক্ষ্য দেয়।[৫৫]

বাংলার ইতিহাসে মুসলমানদের প্রভাবকে কখনোই অগ্রাহ্য করা যায় না। বাংলার ইতিহাসে 'মুসলমানি আমল'কে যারা দেশীয় সাংস্কৃতিক বিবর্তনের এক অধ্যায় মনে করেন না, তারা এ-অঞ্চলে ইসলামের প্রভাবকে বহির্বঙ্গীয় বলে মনে করেন।[৫৬] অথচ, ইতিহাসের এক যুগসন্ধিক্ষণে ইসলাম ভারতে তথা বাংলায় এসেছে। ভারতে ইসলাম কী ভূমিকা পালন করেছিল তার ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটও রয়েছে। এ-ক্ষেত্রে ভারতে ইসলামের ঐতিহাসিক ভূমিকার মূল্যায়নে মানবেন্দ্র নাথ রায়ের (১৮৮৭-১৯৫৪) বক্তব্য উল্লেখ করা যেতে পারে। তাঁর মতে, ইসলাম এক নতুন জীবনদর্শন নিয়ে পৃথিবীতে হাজির হয়েছিল। ইসলামের উত্থান ও দ্রুততম সময়ের মধ্যে

বিস্তারলাভের ঘটনা মানব ইতিহাসেরই এক চমকপ্রদ অধ্যায়। ইসলামের লক্ষ্য কেবল সামরিক বিজয় নয়, বরং বিজিত রাজ্যের ধর্মীয়, অর্থনৈতিক ও সামাজিক আমূল পরিবর্তনকে ইসলাম গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করেছে। এটা ঠিক যে, মুসলমানরা তাদের লক্ষ্য অর্জনের জন্যে সামরিক বিজয় অভিযান পরিচালনা করেছে; তবে তা পুরাতনকে সরিয়ে নতুন ব্যবস্থাকে প্রতিষ্ঠিত করার প্রয়োজনে। তাই বলা যায়, ধর্মীয় আন্দোলনের চেয়ে বরং রাজনৈতিক আন্দোলনরূপেই ইসলামের উত্থান হয়েছিল। এশিয়া ও আফ্রিকার প্রদেশগুলোতে পুরাতন ব্যবস্থার অভিশাপ থেকে বাঁচতে ইসলামের রাজনৈতিক ও ধর্মীয় আদর্শের (একেশ্বরবাদ) কাছে আশ্রয় চেয়েছিল।[৫৭] তাই বলা যায়, ইসলামের মূল চেতনা আরব ইতিহাসের ক্রম ধারায় বিকশিত হয়েছে, হঠাৎ করে নয়।

আবু মহামেদ হবিবুল্লাহ মনে করেন, বাঙালির ইতিহাসে পরস্পরবিরোধী ঝোঁক (Emphasis) ও দ্বিধাগ্রস্ত ঐতিহ্য সৃষ্টি হওয়ার মূল কারণ হচ্ছে—বাংলার ইতিহাসে 'মুসলমানি আমল'কে স্বীয় ইতিহাসের একীভূত (Integral) মনে না-করা। হিন্দুর লিখিত ইতিহাসে মুসলমান 'অপর' হয়ে থাকার কারণেই এখনো বাংলার পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচিত হয়নি। তিনি এর দৃষ্টান্ত হিসেবে বলেছেন, বাঙালির সামাজিক ইতিহাস হিন্দুদের হাতে লিখিত হওয়ার দরুন তারা সচেতনভাবে হিন্দু ব্রাহ্মণ, বীর রাজীবলোচন তথা কালাপাহাড়কে শুধু ইসলাম ধর্মে ধর্মান্তরিত হওয়ার কারণে নৃশংস, কাপুরুষ হিসেবে উল্লেখ করেছে। কিন্তু নৃশংসতায় যিনি তুলনাহীন সেই প্রতাপাদিত্যকে বাঙালির বীরত্বের ও স্বাধীনতার আদর্শ হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে।[৫৮] ফলে, হিন্দুর লিখিত ইতিহাস ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে লেখা হয়েছে এবং এটি বাংলার হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে সাংস্কৃতিক বৈষম্যকেও প্রতিফলিত করেছে। ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে বিচারের কারণে বাংলার ইতিহাস লেখকেরা 'খণ্ডিত ইতিহাস'কে 'মূল ইতিহাস' হিসেবে উপস্থাপন করেছেন। বাঙালি সংস্কৃতির সমতাবিধান না-হওয়ার কারণ হিসেবেও এই 'ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গির একদেশদর্শিতা'কে দায়ী করা যায়।[৫৯]

আবু মহামেদ হবিবুল্লাহ বাঙালি হিন্দু ও মুসলিম উভয় জাতিকে বাঙালির আত্মপ্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে উভয় সম্প্রদায়ের প্রাচীন ইতিহাসকে সমন্বিত অবস্থানে রেখে এগিয়ে যেতে আহ্বান করেছেন। কোনো একটিকে মুখ্য ও অন্যটিকে গৌণ মনে করার অবকাশ এখানে নেই। উভয় ধর্মেরই অন্ধকার ও গৌরবময় ইতিহাস বিদ্যমান আছে। তবুও এক্ষেত্রে সংকীর্ণতার প্রশ্নও উঠতে পারে। সেক্ষেত্রে নিজেদের ইতিহাস, সংস্কৃতি সমস্ত কিছুকে শ্রেষ্ঠজ্ঞান করে বাইরের সঙ্গে সকল সম্পর্ক ছিন্ন করাও নেতিবাচক ফল বয়ে আনবে। তাই বাঙালিকে আত্মসংকীর্ণতা পরিহার করে ইতিহাস ও সংস্কৃতিচর্চায় আত্মসচেতন হয়ে উঠতে হবে। বাঙালি হিন্দু-মুসলমানের অনুধাবন করা উচিত—আত্মসচেতনতা ও সংকীর্ণতা এক বিষয় নয়। 'প্রাদেশিক মনোবৃত্তি' অর্জন মানেও সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি নয়। এই বৈশিষ্ট্য আত্মীকরণের মধ্য দিয়েই বাংলার সাংস্কৃতিক পরিচয় প্রতিষ্ঠিত হতে পারে।[৬০]

'বাঙালী মুসলমানের সাংস্কৃতিক আত্মনিয়ন্ত্রণ' প্রবন্ধের দ্বিতীয় পর্বে আবু মহামেদ হবিবুল্লাহ বাংলার মুসলমান সমাজের 'সংস্কৃতির অবিভাজ্যতা'র ধারণাকে যৌক্তিক বিশ্লেষণে খণ্ডন

করেছেন। অনেকের মতে, বাংলার মুসলমান সমাজে সংস্কৃতির অবিভাজ্যতাকে অস্বীকার করা যায় না। কারণ, মুসলমান সমাজের মতো তাদের সংস্কৃতির মধ্যেও সাযুজ্য লক্ষণীয়।[৬১] সংস্কৃতির এই অবিভাজ্যতার জন্যেই বাঙালি মুসলমান ব্যবহারিক জীবনে 'প্রাদেশিক মনোবৃত্তি'কে প্রাধান্য দিতে পারে না, যেমনটা বাঙালি হিন্দু পারে। এ-কারণে, বাঙালি হিন্দুর সামাজিক আচার, পোশাক ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানের সঙ্গে বহির্বঙ্গীয় রীতির সঙ্গে অমিল লক্ষ করা যায়। লেখক মনে করেন, বাংলার মুসলমানের 'বাঙালি' হওয়ার অন্তরায় হচ্ছে—বিশ্ব মুসলিম সমাজের সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীর অংশ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা। সেই সঙ্গে বাংলার মুসলমানের 'বাঙালিত্ব' প্রতিষ্ঠায় 'ইসলামের বিশ্বময়তা ও সাংস্কৃতিক ঐক্যের বিরোধী বলে আপত্তি উঠতে পারে।'[৬২] বাঙালি মুসলমানের এই আশঙ্কা যে অমূলক হবিবুল্লাহ তা যুক্তিসহকারে ব্যাখ্যা করেছেন। প্রথমত, যে 'মুসলিম সংস্কৃতি' থেকে বাঙালি মুসলমান বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা করে তার স্বরূপ জানা প্রয়োজন। ইসলাম ধর্মের একটি বিশ্বজনীন রূপ রয়েছে। দেশভেদে, রাষ্ট্রভেদে, সমাজভেদে ইসলাম ধর্মের অনুসারীদের মধ্যেও নানান বৈচিত্র্য বিদ্যমান রয়েছে। এই বৈচিত্র্যের মধ্যেও যে অন্তর্নিহিত ঐক্য রয়েছে তাকেই বলা হয় মুসলিম সংস্কৃতি।[৬৩] দ্বিতীয়ত, সংস্কৃতি পালনে রাষ্ট্রশক্তির ভূমিকার কথাও বিবেচ্য—রাষ্ট্রশক্তির আনুকূল্যের জন্যেই কোনো একটা সংস্কৃতি সবার ওপর প্রাধান্য বিস্তার করে। তবে, রাষ্ট্রশক্তি নির্ভর সংস্কৃতি পালনের এই সাদৃশ্য কখনো জাতিগত বৈশিষ্ট্যের ওপর জয়ী হতে পারে না।[৬৪] দৃষ্টান্ত হিসেবে বলা যায়, আরবের সংস্কৃতি ইরানি সংস্কৃতির ওপর জয়ী হতে পারেনি।

মুসলমান প্রধান রাষ্ট্রগুলোতে হিন্দুদের জীবনপ্রণালিতে যেমন পরিবর্তন এসেছে, তেমনি অমুসলিমদের প্রভাবে পরিবর্তন হয়েছে মুসলিমদের জীবনানুশীলন। উভয়ের ক্ষেত্রে উভয়ের প্রভাব থাকা সত্ত্বেও ভাষা, সাহিত্য, শিল্পকলা, সাহিত্য—সবক্ষেত্রে জাতীয় চেতনার প্রকাশ দেখা যায়। ফলে, বাঙালি মুসলমানরা যদি ভাবে বাঙালি সংস্কৃতির চর্চা করলে তারা ইসলামি বিশ্ব থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে তাহলে সেটা হবে অমূলক। কেননা মুসলিমদের জীবনাচারে বৈচিত্র্য থাকা কোনো অস্বাভাবিক বিষয় নয়।[৬৫]

'জাতিগত বৈশিষ্ট্যে'র বাইরে ভাষা অনুসারেও 'মুসলিম সংস্কৃতির অবিভাজ্যতা'র প্রমাণ হয় না। ইতিহাসের ভাষ্যমতে, আট শতক থেকে টাইগ্রিস নদীকে কেন্দ্র করে দুই তীরে আরবীয় সংস্কৃতি ও ইরানি সংস্কৃতির বিকাশ ঘটেছিল। এই উভয় সংস্কৃতি ইসলামের অনুসারী হলেও দুইটাতেই ছিল ব্যাপক পার্থক্য। এর মধ্যে ভাষাগত পার্থক্যকে (আরবি ও ফার্সি) মুখ্য হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। আরব থেকে নিয়ে উত্তর আফ্রিকা ও স্পেনের যে সংস্কৃতি তা পুরোপুরিই আরবি ছিল।[৬৬] তবে, আরবের শাস্ত্রীয় ইসলামের ব্যাপক পরিবর্তনও হয় ইরানিদের হাতে—যার আধিপত্য ভারতীয় মুসলমানদের ওপরেও বিরাজ করছে। কারণ, ভারতীয় মুসলিম সভ্যতায় ইরানি সংস্কৃতির 'মুসলমানি রূপ'ই প্রাধান্য পেয়েছে।[৬৭] এছাড়াও প্রাক্ ইসলামি ভারতের মুসলমানরা বিনাদ্বিধায় আরবীয় সংস্কৃতির বাইরেও অনেক কিছুকেই অনুসরণ করেছে, অনুকরণও করেছে। ফলে, বাঙালি সংস্কৃতির চর্চায় 'মুসলমানিত্ব' খর্ব হওয়ার শঙ্কার জায়গাটি অমূলক ও অযৌক্তিক বলে ধরে নেয়া

যায়। কারণ, ইসলাম ধর্মের মৌলিক বিষয়াবলি বজায় রেখে এর সঙ্গে দেশীয় সংস্কৃতির সমন্বয় বাঙালি সংস্কৃতিতে কোনো ধরনের দ্বন্দ্ব তৈরি করে না।[৬৮] তাই, বাঙালি মুসলমান যদি বাঙালি সংস্কৃতিচর্চায় কোনো উদ্বেগ বা আশঙ্কা না-রেখে এ-সংস্কৃতিতে স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ করে তাহলে তাদের আত্মনিয়ন্ত্রণ তথা আত্মপ্রতিষ্ঠার পথকেই সুগম করবে।

'বাঙালী মুসলমানের সাংস্কৃতিক আত্মনিয়ন্ত্রণ' প্রবন্ধের তৃতীয় পর্বে আবু মহামেদ হবিবুল্লাহ বাঙালি মুসলমানের আত্মনিয়ন্ত্রণ ও আত্মপ্রতিষ্ঠার উপায়গুলো (বিশেষত, সাহিত্য ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে) নিয়ে আলোচনা করেছেন। এ-ক্ষেত্রে তিনি বাঙালি সংস্কৃতিতে 'ইসলামি ভাবে'র যৌক্তিক সংযোজন বা অভিযোজনের উপায়সমূহ বাতলে দিয়েছেন। সেই সঙ্গে বাঙালি সংস্কৃতিকে কীভাবে পূর্ণাঙ্গ রূপ দেওয়া যায় তার আলোচনাও করেছেন।

আবু মহামেদ হবিবুল্লাহ মনে করেন, মুসলমানের অংশগ্রহণ নেই বলে বাঙালি সংস্কৃতি পুরোপুরি 'বাঙালি' হয়ে ওঠেনি। এ-সংস্কৃতিতে বাঙালি মুসলমানের অনুপ্রবেশ এখনও সেভাবে ঘটেনি। তাই একে আদর্শ সংস্কৃতিও বলা যায় না।[৬৯] বর্তমানে বাঙালি যে সংস্কৃতি চর্চা করে তা মূলত হিন্দু প্রভাবিত। তাই, একে পুরোপুরি 'বাঙালি সংস্কৃতি' হয়ে উঠতে হলে বাঙালি মুসলমানের ধর্মীয় অনুষ্ঠানগুলোকে বর্জন না-করে বরং গ্রহণের দিকেই মনোনিবেশ করতে হবে। বিশেষত, বাঙালি সংস্কৃতির পূর্ণ রূপ পাওয়ার জন্যে মুসলিম ইতিহাস, ঐতিহ্য ও তার জীবনধারাকে 'বাঙালি সংস্কৃতি'তে অন্তর্ভুক্ত করার প্রয়োজন রয়েছে।[৭০] প্রসঙ্গত বলা দরকার, প্রাবন্ধিক বাঙালি সংস্কৃতিকে পরিপূর্ণ রূপ দেওয়ার ক্ষেত্রে অন্য সকলের চেয়ে বাঙালি মুসলমানেরই কর্তব্য বেশি বলে মনে করেন। বাঙালি সংস্কৃতি হিন্দুর দানে যেমন সমৃদ্ধ, তেমনি বাঙালি মুসলমানের দান পেলেই তা পরিপূর্ণ হয়ে উঠবে বলে আশা করা যায়। অর্থাৎ, বাঙালি সংস্কৃতির পূর্ণাঙ্গ রূপ পাওয়ার উপায় হচ্ছে—এ-সংস্কৃতিতে হিন্দুর দান স্বীকার করা এবং মুসলিম জীবনের উপাদানসমূহ যুক্ত করা। এ-ক্ষেত্রে বাঙালি মুসলমান লেখকদের দায়িত্ব হচ্ছে, সাহিত্যে নিজের শক্ত অবস্থান তৈরি করা এবং মুসলিম জীবনের উপাদানসমূহকে বাংলা সাহিত্যে সার্থকভাবে উপস্থাপন করা। আর বাঙালি মুসলমানকেও তাদের আত্মপ্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে মননে-মগজে এভাবে স্বতঃস্ফূর্ত হতে হবে, সংকীর্ণতা ও শঙ্কা পরিহার করতে হবে—'সংস্কৃতির সর্বক্ষেত্রেই মুসলমানকে নিজের ট্র্যাডিশন ও আদর্শ নিয়ে এগিয়ে আসতে হবে এবং সে ট্র্যাডিশিনের আবিষ্কারক ও প্রচারক হতে হবে তার নিজেকেই।'[৭১] বাঙালি মুসলমানের সাংস্কৃতিক আত্মনিয়ন্ত্রণের এটাই বড় উপায়। তাছাড়া এর মাধ্যমে বাঙালি মুসলমান তার আত্মপরিচয়ের সংকট থেকেও মুক্তি পাবে—এমনটা আশা করা যায়। কারণ, বাঙালি জাতির আত্মপ্রতিষ্ঠার পথ শুধু রাজনৈতিক বিকাশের মধ্যে নিহিত নয়, বরং ব্যবহারিক ও মানসিক জীবনকে উন্নত করার মধ্যেই তাদের সুষ্ঠু সংস্কৃতির বিকাশ ঘটতে পারে। আর সে-জন্যে বাঙালি মুসলমানের 'সাংস্কৃতিক আত্মনিয়ন্ত্রণে'র গুরুত্ব সর্বাগ্রে। সেটা কীভাবে করা যায় তাই মূলত আবু মহামেদ হবিবুল্লাহর আলোচনার মূল বিষয়।

আবু মহামেদ হবিবুল্লাহ বাঙালি মুসলমানের আত্মপরিচয়ের স্বরূপ বোঝার ক্ষেত্রে এ-জনগোষ্ঠীর (বাংলার হিন্দু ও মুসলমান) ইতিহাসকে ভালো করে জানার প্রয়োজন বলে মনে করেন। তিনি

আত্মপরিচয়ের সংকট থেকে উত্তরণের জন্যে বাঙালি মুসলমানের জাতিগত পরিচয়, ভাষা, ধর্ম ও সংস্কৃতিকে গুরুত্ব দিয়েছেন। তিনি মনে করেন, বাঙালি মুসলমান সাংস্কৃতিক আত্মনিয়ন্ত্রণের মধ্য দিয়ে তার আত্মপরিচয়ের সংকট থেকে বেরিয়ে আসতে পারবে। এ-জন্যে তিনি মুসলিম জীবনের ইতিহাস-ঐতিহ্য, জীবনাদর্শ ও মুসলিম সংস্কৃতিকে 'বাঙালি সংস্কৃতি'তে সংযোজনের ওপর জোর দিয়েছেন।

৩. উপসংহার

পরিশেষে বলা যায়, আবু মহামেদ হবিবুল্লাহ বাঙালি মুসলমানের আত্মপরিচয়ের সংকট তৈরির পরিপ্রেক্ষিত বোঝার জন্যে বাংলার মুসলমানদের ইতিহাসের বাক্-পরিবর্তনসমূহ বিশ্লেষণ করেছেন। বাঙালি মুসলমানের আত্মপরিচয়ের স্বরূপ জানার জন্যে এ-জনগোষ্ঠীর ইতিহাস-ঐতিহ্য, বাঙালি মুসলমানের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ নিয়ে আলোচনা করেছেন। বাঙালি মুসলমানের আত্মপরিচয়ের ভিত্তি নির্মাণে তিনি জাতিগত পরিচয়, ভাষাগত পরিচয় ও সাহিত্যে তার সংস্কৃতির (মুসলিম সংস্কৃতি) যথার্থ প্রতিফলনের ওপর দৃষ্টি দিয়েছেন। তিনি মুসলিম সংস্কৃতিকে প্রভাবশালী হিসেবে নির্মাণ করাকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ মনে করেছেন। অতীতের মোহ নয়, অন্ধ আবেগ নয়, পরিচয়হীনতার সংকোচও নয়, বরং তিনি যৌক্তিকভাবে বাঙালি মুসলমান জাতিগত পরিচয়ে যে 'বাঙালি' তা বলেছেন। এ-কারণে, বাঙালি মুসলমানের সংস্কৃতিও 'বাঙালি সংস্কৃতি'। এ-সংস্কৃতিতে 'অপর' হয়ে থাকা এক অর্থে আত্মপরিচয়হীনতারই নামান্তর। তাই, তিনি বাঙালি সংস্কৃতিতে কীভাবে মুসলিম জীবনের জীবনাদর্শ সংযোজন করা যায় তার ওপর সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছেন। কারণ, আত্মপরিচয়ের প্রধান ক্ষেত্র হচ্ছে নিজের ধর্ম, ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে সক্রিয় থাকা। তিনি মনে করেন, বাঙালি মুসলমান যেদিন তার ইতিহাস-ঐতিহ্যকে সাহিত্যে যথাযথভাবে তুলে ধরতে পারবে এবং 'বাঙালি সংস্কৃতি'তে সক্রিয় ও প্রভাবশালী ভূমিকায় হাজির হবে, সেদিন তার আত্মপরিচয়ের সংকটও অনেকখানি দূর হবে। যাহোক, আবু মহামেদ হবিবুল্লাহর বাঙালি মুসলমানের আত্মপরিচয় সম্পর্কিত প্রবন্ধাবলি বিশ্লেষণ ও আলোচনার শেষান্তে বেশকিছু সিদ্ধান্তে আসা যায়। নিম্নে তাঁর বাঙালি মুসলমানের আত্মপরিচয় সম্পর্কিত চিন্তার ফলাফল পেশ করা হলো।

প্রথমত, বাঙালি মুসলমানের আত্মপরিচয় সংকটের ধর্মীয়, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপট রয়েছে। আবু মহামেদ হবিবুল্লাহ 'বাংলার মুসলমান' নামক প্রবন্ধে বিশ্লেষণের মাধ্যমে বাঙালি মুসলমানের আত্মপরিচয়ের সংকট যে দীর্ঘ সময়ে ও নানান ঘটনার প্রতিক্রিয়ায় সৃষ্টি হয়েছে তা তুলে ধরেছেন। আবু মহামেদ হবিবুল্লাহ বাঙালি মুসলমানের আত্মপরিচয় সংকটের প্রেক্ষাপট বোঝার জন্যে এ-অঞ্চলের (বাংলা) ইতিহাসের ঘটনাবলিকে পর্যবেক্ষণ করেছেন। তিনি 'বাঙালি মুসলমানের আত্মপরিচয়' সন্ধানে ছিলেন ইতিহাসমুখী। তাঁর ইতিহাসচর্চার বিশাল অংশজুড়ে ছিল ভারতীয় ও বাংলার মুসলিম-মানসের স্বরূপ বিশ্লেষণ এবং মুসলিম মানসের বিবর্তন ধারার উৎসকে খতিয়ে দেখা। অসংখ্য ঘাত-প্রতিঘাত, উত্থান-পতনের

ভেতর দিয়ে বাংলার সমাজ ও সভ্যতায় মুসলিম-মানসের অগ্রসর হওয়ার বিষয়টি তিনি গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করেছেন।[৭২]

দ্বিতীয়ত, আবু মহামেদ হবিবুল্লাহ বাঙালি মুসলমানের আত্মপরিচয়-সংকটের মূল জায়গাসমূহ চিহ্নিত করেছেন ('বাংলার মুসলমান' ও 'বাঙালী মুসলমানের ইতিহাস' প্রবন্ধ)। যেমন—মুঘল শাসনামলেই বাংলার মুসলমানদের ধর্ম ও সংস্কৃতির স্বাভাবিক বিকাশ ব্যাহত হয়েছে এবং বাংলায় জাতিভেদ সৃষ্টিতেও মুঘল শাসকদের দায় রয়েছে। এর পাশাপাশি তিনি ইংরেজ বিভেদনীতিও বাঙালি মুসলমানের মধ্যে আত্মপরিচয়ের সংকট তৈরিতে সহায়তা করেছে বলে মনে করেন। আরও একটা বিষয়কে তিনি গুরুত্ব দিয়েছেন। সেটা হচ্ছে—বাঙালি মুসলমান সমাজে মধ্যবিত্তশ্রেণির বিকাশে বিলম্ব হওয়া; এর জন্যে তিনি মুসলমান সমাজের প্রতি ব্রিটিশ শাসকদের অসহযোগিতামূলক আচরণকে দায়ী করেছেন। প্রধানত, এসব বিষয় বাঙালি মুসলমানের আত্মপরিচয়ের সংকটকে সামনে নিয়ে আসে।

তৃতীয়ত, আবু মহামেদ হবিবুল্লাহ কেবল বাঙালি মুসলমানের আত্মপরিচয়ের সংকটকে চিহ্নিতই করেননি, বরং এ-সংকট থেকে উত্তরণের উপায়সমূহ নিয়েও যৌক্তিক আলোচনা করেছেন। এ-ক্ষেত্রে 'বাংলার মুসলমান', 'বাঙালী মুসলমানের ইতিহাস', 'বাঙালী মুসলমানের সাহিত্য, সংস্কৃতি ও সমাজ' ও 'বাঙালী মুসলমানের সাংস্কৃতিক আত্মনিয়ন্ত্রণ' প্রবন্ধসমূহকে দৃষ্টান্ত হিসেবে উল্লেখ করা যেতে পারে। তিনি আত্মপরিচয় নির্মাণে ইতিহাস, সাহিত্য ও সংস্কৃতিকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছেন। কারণ, তিনি মনে করেন, বাংলায় মুসলমান শাসনামলের ইতিহাস খুব অবহেলিতভাবে বর্ণিত হয়েছে। বাঙালি মুসলমানের ইতিহাসচর্চায় সচেতনতা, বাংলা সাহিত্যে মুসলিম জীবনের যথার্থ প্রতিফলন এবং 'বাঙালি সংস্কৃতি'তে মুসলিম জীবনের উপকরণসমূহ যুক্ত করা—এর মধ্য দিয়েই তার আত্মপরিচয় নির্মিত হতে পারে। এর বাইরে তিনি বাঙালি মুসলমানের জাতিগত ও ভাষাগত পরিচয়কেও গুরুত্ব দিয়েছেন। সেই সঙ্গে গুরুত্ব দিয়েছেন বাঙালি মুসলমানের সামাজিক বিকাশের ধারাকে। যাহোক, বাঙালি মুসলমানের আত্মপরিচয়ের ক্ষেত্রে তাঁর সিদ্ধান্ত হচ্ছে—বাঙালি মুসলমান আগে বাঙালি, তারপর মুসলমান। তবে সব কিছুর উর্ধ্বে সে আগে মানুষ বলেই বুদ্ধিমত্তা, জীবনবোধ (ধর্ম) তার অবিচ্ছেদ্য গুণ। তাই সে একই সঙ্গে মানুষ, বাঙালি ও মুসলমান। তিনি বাংলার ইতিহাস-ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ও বাংলা ভাষাকে গ্রহণের কথা বলেছেন এবং 'বাঙালি সংস্কৃতি'তে মুসলিম জীবনাদর্শ যোগ করে একে পরিপূর্ণ করে তোলার কথাও বলেছেন।

চতুর্থত, বাঙালি মুসলমানের আত্মপরিচয়ের স্বরূপ অন্বেষণের ক্ষেত্রে প্রাবন্ধিক আবু মহামেদ হবিবুল্লাহ 'মুসলিম সাহিত্য-সমাজে'র (১৯২৬) চিন্তকদেরই উত্তরসাধক। বর্তমান সময়েও তাঁর চিন্তার প্রাসঙ্গিকতা আছে। কারণ, বাঙালি মুসলমানকে স্মরণ করিয়ে দেওয়ার দরকার আছে যে তার জাতিগত পরিচয় 'বাঙালি' এবং ধর্মীয় পরিচয় 'মুসলমান'। আর ধর্মীয় পরিচয় কখনও জাতিগত পরিচয়কে ছাপিয়ে উঠতে পারে না। এই দুই পরিচয়ের মধ্যে দ্বান্দ্বিক অবস্থা সৃষ্টিরও সুযোগ নেই। যাহোক, বাঙালি মুসলমানের 'আত্মপরিচয়' সংক্রান্ত ভাবনায় লেখকের গভীর জীবনদৃষ্টির পরিচয়ও প্রতিফলিত হয়েছে। এ-কারণে, 'বাঙালি মুসলমানের আত্মপরিচয়' তথা

স্বতন্ত্র সত্তার অনুসন্ধানে আবু মহামেদ হবিবুল্লাহর গবেষণালব্ধ উপলব্ধিকে বাঙালি মুসলমান সমাজের আলোকবর্তিকা হিসেবে আখ্যায়িত করা যায়।

তথ্যনির্দেশ ও টীকা

১ মমতাজুর রহমান তরফদার, 'অধ্যাপক আবু মহামেদ হবিবুল্লাহ', *আবু মহামেদ হবিবুল্লাহ স্মারকগ্রন্থ*, সালাহউদ্দীন আহমদ ও অন্যান্য [সম্পা.], (ঢাকা: বাংলাদেশ ইতিহাস পরিষদ, ১৯৯১), পৃ. ১৮

২ নূরুল ইসলাম মনজুর, 'মধ্যযুগের বাংলা ও ভারতীয় ইতিহাসের মূলসূত্র অন্বেষণ: আবু মহামেদ হবিবুল্লাহ', *বাঙালির ইতিহাস চর্চার ধারা* (ঢাকা: উৎস প্রকাশন, ২০১৭), পৃ. ৩৩০

৩ রতনলাল চক্রবর্তী, *আবু মহামেদ হবিবুল্লাহ* (ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ১৯৮৯), পৃ. ২৮

৪ আবু মহামেদ হবিবুল্লাহ, 'বাংলার মুসলমান', *সমাজ সংস্কৃতি ও ইতিহাস*, মুহম্মদ সাইফুল ইসলাম [সম্পা.], (ঢাকা: কথাপ্রকাশ, ২০১৭), পৃ. ১৩৫

৫ আমিনুল ইসলাম, 'বাংলায় মুসলমানের আগমন', *হাজার বছরের বাংলার মুসলমান* (ঢাকা: দিব্যপ্রকাশ, ২০২৪), পৃ. ৯

৬ আবু মহামেদ হবিবুল্লাহ, 'বাংলার মুসলমান', *সমাজ সংস্কৃতি ও ইতিহাস*, মুহম্মদ সাইফুল ইসলাম [সম্পা.], পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩৬

৭ তদেব, পৃ. ১৩৭

৮ তদেব

৯ তদেব, পৃ. ১৪০

১০ তদেব

১১ তদেব, পৃ. ১৪২

১২ কাজী আবদুল ওদুদ, 'বাংলার মুসলমানের কথা', *শাশ্বত বঙ্গ* (ঢাকা: হাওলাদার প্রকাশনী, ২০১৪), পৃ. ১১৮

১৩ Richard M. Eaton, *The Rise of Islam and the Bengal Frontier, 1204–1760* (Berkley, Los Angeles and London: University of California Press, 1993), P. 114, 115

১৪ উদ্ধৃত: ওয়াকিল আহমদ, *উনিশ শতকে বাঙালি মুসলমানের চিন্তা ও চেতনার ধারা* (ঢাকা: নভেল পাবলিশিং হাউস, ২০১৩), পৃ. ৪; [মূল: Khondker Fuzli Rubbee, *The Origin of the Musalmans of Bengal*, Calcutta, 1895]

১৫ এম. এ. রহিম, *বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস* (ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ২০২২), পৃ. ৪৮

১৬ Asim Roy, *The Islamic Syncretistic Tradition in Bengal* (Princeton, New Jersey: Princeton University Press, 1983), pp. 207, 208

১৭ আকবর আলি খান, *বাংলাদেশের সত্তার অন্বেষা*, আমিনুল ইসলাম ভূইয়া [অনু.], (ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ২০২২), পৃ. ৯৯

১৮ গৌতম রায়, 'বাঙালি মুসলমানের আত্মপরিচয়', *বাঙালি ও বাংলাদেশের মন* (ঢাকা: কথাপ্রকাশ, ২০২৪), পৃ. ১৬

১৯ আবু মহামেদ হবিবুল্লাহ, 'বাংলার মুসলমান', *সমাজ সংস্কৃতি ও ইতিহাস*, মুহম্মদ সাইফুল ইসলাম [সম্পা.], পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪৩

২০ তদেব, পৃ. ১৪৪

২১ তদেব

২২ তদেব, পৃ. ১৪৫

২৩ তদেব

২৪ তদেব

২৫ তদেব

২৬ আবু মহামেদ হবিবুল্লাহ, 'বাঙালী মুসলমানের ইতিহাস', *সমাজ সংস্কৃতি ও ইতিহাস*, মুহম্মদ সাইফুল ইসলাম [সম্পা.], (ঢাকা: কথাপ্রকাশ, ২০১৭), পৃ. ১৬৩

২৭ তদেব

২৮ তদেব

২৯ তদেব, পৃ. ১৬৩, ১৬৪

৩০ আবদুল হক, 'বাঙালী মুসলমান: ভূমিকা ও নিয়তি', *বাঙালী জাতীয়তাবাদ ও অন্যান্য প্রসঙ্গ*, গোলাম মুস্তাফা [সম্পা.], (ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ২০১৭), পৃ. ১৫

৩১ আবু মহামেদ হবিবুল্লাহ, 'বাঙালী মুসলমানের ইতিহাস', *সমাজ সংস্কৃতি ও ইতিহাস*, মুহম্মদ সাইফুল ইসলাম [সম্পা.], পূর্বোক্ত, পৃ. ১৬৪

৩২ তদেব

৩৩ তদেব

৩৪ তদেব, পৃ. ১৬৬

৩৫ তদেব

৩৬ আবু মহামেদ হবিবুল্লাহ, 'বাঙালী মুসলমানের সাহিত্য, সংস্কৃতি ও সমাজ', *সমাজ সংস্কৃতি ও ইতিহাস*, মুহম্মদ সাইফুল ইসলাম [সম্পা.], (ঢাকা: কথাপ্রকাশ, ২০১৭), পৃ. ১৪৬

৩৭ তদেব

৩৮ তদেব, পৃ. ১৪৭

৩৯ তদেব

৪০ এম. এ. রহিম, *বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস* (ঢাকা: আহমদ পাবলিশিং হাউজ, ২০১৯), পৃ. ২১

৪১ 'লাখেরাজ' আরবি শব্দ। এর অর্থ নিষ্কর। মুঘল শাসনামলের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য ছিল 'লাখেরাজ' ভূমি কর বা খাজনা মওকুফকৃত জমি। ১৭৭৬ খ্রিষ্টাব্দের আমিনি কমিশনের মতে, সম্রাজ্যের রাজস্ব ভূমির একটি উল্লেখযোগ্য অংশ বিভিন্ন শ্রেণির লাখেরাজদের অনুকূলে পতিত হয়েছিল। তখন সরকারি দলিলে এসব ভূমিকে বলা হত বাজে ভূমি তথা যেসব ভূমি বা জলাশয় থেকে সরকার কোনো রাজস্ব পায় না। দেখুন: Ram Sharan Sharma, *Land Revenue in India: Historical Studies* (Motomahal Banarsidas, Delhi, 1971), p. 126

৪২ এম. এ. রহিম, *বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫০

৪৩ আবু মহামেদ হবিবুল্লাহ, 'বাঙালী মুসলমানের সাহিত্য, সংস্কৃতি ও সমাজ', *সমাজ সংস্কৃতি ও ইতিহাস*, মুহম্মদ সাইফুল ইসলাম [সম্পা.], পর্বোক্ত, পৃ. ১৪৮

৪৪ তদেব, পৃ. ১৪৯

৪৫ তদেব

৪৬ তদেব

৪৭ তদেব, পৃ. ১৫২

৪৮ তদেব

৪৯ তদেব, পৃ. ১৫৩

৫০ কাজী আবদুল ওদুদ, 'বাঙ্গালী মুসলমানের সাহিত্য-সমস্যা', *শিখা সমগ্র*, মুস্তাফা নূরউল ইসলাম [সং. ও সম্পা.], (ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ২০১৯), পৃ. ৪০

৫১ আবু মহামেদ হবিবুল্লাহ, 'বাঙালী মুসলমানের সাংস্কৃতিক আত্মনিয়ন্ত্রণ', *সমাজ সংস্কৃতি ও ইতিহাস*, মুহম্মদ সাইফুল ইসলাম [সম্পা.], (ঢাকা: কথাপ্রকাশ, ২০১৭), পৃ. ১৫৯

৫২ তদেব, পৃ. ১৫৪

৫৩ তদেব

৫৪ তদেব, পৃ. ১৫৩, ১৫৪

৫৫ তদেব, পৃ. ১৫৫

৫৬ তদেব

৫৭ মানবেন্দ্র নাথ রায়, *ইসলামের ঐতিহাসিক ভূমিকা*, সৈয়দ তোশারফ আলী [অনু.], (ঢাকা: দ্যু প্রকাশন, ২০১৮), পৃ. ২৫

৫৮ আবু মহামেদ হবিবুল্লাহ, 'বাঙালী মুসলমানের সাংস্কৃতিক আত্মনিয়ন্ত্রণ', *সমাজ সংস্কৃতি ও ইতিহাস*, মুহম্মদ সাইফুল ইসলাম [সম্পা.], পূর্বোক্ত, পৃ. ১৫৫

৫৯ তদেব, পৃ. ১৫৬

৬০ তদেব, পৃ. ১৫৭

৬১ তদেব

৬২ তদেব, পৃ. ১৫৮

৬৩ তদেব

৬৪ তদেব

৬৫ তদেব

৬৬ তদেব, পৃ. ১৫৯

৬৭ তদেব

৬৮ তদেব

৬৯ তদেব

৭০ তদেব, পৃ. ১৫৯, ১৬০

৭১ তদেব, পৃ. ১৬২

৭২ নূরুল ইসলাম মনজুর, 'মধ্যযুগের বাংলা ও ভারতীয় ইতিহাসের মূলসূত্র অন্বেষণ: আবু মহামেদ হবিবুল্লাহ', *বাঙালির ইতিহাস চর্চার ধারা*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৬৩